দ্বিতীয় অধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিন্যাস ও বিষয় বৈচিত্র্য ঃ

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ শকুন্তলা (১৮৯৫)। প্রায় আটটি রচনা খুব নিকটবর্তী সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ১৯২১ সালে 'খাতাঞ্চির খাতা' প্রকাশের প্রায় তেরো বছর পর ১৯৩৪ সালে 'খুদ্দুর যাত্রা' প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে মাঝে মাছে চার-পাঁচ বছরের ব্যবধান থাকলেও ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁর অনেকগুলি রচনা পাওয়া যায়। তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক বিন্যাস নিম্নরূপ —

শকুন্তলা (১৮৯৫), ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬), রাজকাহিনী (১৯০৯), ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫) , নালক (১৯১৬), পথে বিপথে (১৯১৮), বাংলার ব্রত (১৯১৯), খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১), খুদ্দুর যাত্রা (১৯৩৪), বুড়ো আংলা (১৯৪১), বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী (১৯৪১), ঘরোয়া (১৯৪১), জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪১), সহজ চিত্রশিক্ষা (১৯৪৬), ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ (১৯৪৭), আলোর ফুলকি (১৯৪৭), ভারত শিল্পের মূর্ত্তি (১৯৪৭), আপন কথা (১৯৫৩), মাসি (১৯৫৪), শিল্পায়ণ (১৯৫৫), মারুতির পুঁথি (১৯৫৬), চাঁইবুড়োর পুঁথি (১৯৫৯), হানাবাড়ির কারখানা (১৯৬৩), মহাবীরের পুঁথি (১৯৬৬), যাত্রাগানে রামায়ণ (১৯৬৯), বাদশাহী গল্প (১৯৭১)।

<u>অবনীন্দ্রনাথের রচনার বিষয় বৈচিত্র্য ঃ</u> বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসারে আলোচনার সুবিধার জন্য অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীকে চারটি ভাগে ভাগ করা হল —

<u>কাহিনী কেন্দ্রিক ঃ</u> শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, নালক, খাতাঞ্চির খাতা, বুড়ো আংলা, আলোর ফুলকি, মারুতির পুঁথি, চাঁইবুড়োর পুঁথি, হানাবাড়ির কারখানা, মহাবীরের পুঁথি, বাদশাহী গল্প, দেবী প্রতিমা, চাঁদনি, কানকাটা রাজার দেশ, আলেখ্য, গঙ্গা-যমুনা, আইনে চীন্-ই, জয়শ্রী, সূত্রপাত, বাপুষ্টী, উদয়াস্ত, যুগ্মতারা, গোরিয়াঁ, চৈতন্য চুটকি, শিবসদাগর, মাতৃগুপ্ত, চাঁইদাদার গল্প, কাষ্ঠবেড়ালের পুঁথি।

<u>যাত্রাপালা ঃ</u> খুদ্দুরযাত্রা, উড়নচণ্ডীর পালা, মউর ছালের পালা, কঞ্জুষের পালা, গজ-কচ্ছপের পালা, ভূতপত্রীর যাত্রা, ধোড়া কাক বুড়ো শেয়ালের পালা, বেনুকুঞ্জের পালা, লম্বকর্ণ পালা, ঋষিযাত্রা, হংসনামা, এসপার ওসপার, বৃক ও মেষপালা, জাবালীর পালা, ফসকান পালা, দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা, কাকপক্ষীর পালা, পুতলীর পালা, ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চীর পালা, গোল্ডেন গুজ পালা, ঘোড়াহাটের পালা, অরণ্যকাণ্ড পালা, দুঃসহ পালা, কথামালার যাত্রার সঙ, সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্য, যাত্রাগানে রামায়ণ।

স্মৃতিকথা ঃ ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে, আপন কথা, মাসি, স্বর্গগত শ্রীমদ্ওকাকুরা, ভারতির ছবি, অবনীন্দ্রবাবুর পত্র, চিঠি, সত্যেন্দ্র নাচঘরের আবহাওয়া, বাংলা থিয়েটারের এক টুকরো, স্মৃতির পরশ, বড়ো জ্যাঠামশাই - ১, জগদিন্দ্রনাথ স্মরণে, ব্যাপটাইজ, শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু, বড়ো জ্যাঠামশাই - ২, আবহাওয়া, শিশুদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের সেকালের পুজো, আমাদের পারিবারিক সংগীত চর্চা, ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ, শিশুবিভাগ, হারানিধি।

প্রবন্ধ ঃ ভারতশিল্প, বাংলার ব্রত, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, সহজ চিত্র শিক্ষা, ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ, ভারত শিল্পের মূর্তি, শিল্পায়ণ, ছেলে ভোলানো ছড়া, স্বর্গীয় রবিবর্মা, ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আদর না অনাদর, নামকরণ রহস্য, কলঙ্কভঞ্জন, শিল্পে ভক্তিমন্ত্র, ভাবসাধনা, কালোর আলো, প্রাণ প্রতিষ্ঠা, কানাকড়ি, পত্তন, চিত্রের পরিচয়, পথে পথে, আদ্যিকালের ছবি।

এছাড়াও বিভিন্ন সাময়িক পত্রে অবনীন্দ্রনাথের কিছু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি প্রকাশের বঙ্গাব্দ অনুসারে সাজানো হল —

রচনার শিরোনাম	বঙ্গাব্দ	সাময়িক পত্রের নাম
দেবী প্রতিমা	১৩০৫	ভারতী
চাঁদনি	১৩০৬	ছেলে ও ছবি
কানকাটা রাজারা দেশ	১৩০৬	ছেলে ও ছবি
আলেখ্য	১৩১২	ভারতী
স্বর্গীয় রবিবর্মা	১৩১৩	প্রবাসী
ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আদর না অনাদর	১৩১৩	ভাণ্ডার
পরিচয়	১৩১৫	ভারতী
নামকরণ রহস্য	১৩১৬	বঙ্গদর্শন
কলঙ্কভজন	১৩১৬	প্রবাসী
গঙ্গা-যমুনা	১৩১৬	ভারতী
আইনে চীন-ই	১৩১৬	ভারতী
শিল্পে ভক্তি মন্ত্র	১৩১৭	ভারতী
ভাব-সাধনা	১৩১৭	ভারতী
কালের আলো	১৩১৮	ভারতী
জয়শ্রী	১৩১৯	ভারতী
সূত্রপাত	১৩১৯	ভারতী

রচনার শিরোনাম	বঙ্গাব্দ	সাময়িক পত্রের নাম
বাপুষ্টা	১৩১৯১	ভারতী
উদয়াস্ত	১৩১৯	ভারতী
যুগ্মতারা	১৩১৯	ভারতী
টাইটানিকের হিসাব নিকাস	১৩১৯	প্রত্যহ
গোরিয়া	১৩২০	ভারতী
প্রাণ প্রতিষ্ঠা	১৩২০	ভারতী
কানাকড়ি	১৩২০	প্রবাসী
পত্তন	১৩২০	প্রবাসী
স্বর্গগত শ্রীমদ্ওকাকুরা	১৩২০	ভারতী
চিত্রের পরিচয়	১৩২১	প্রবাসী
পথে পথে	১৩২২	ভারতী
আদ্যিকালের ছবি	১৩২২	ভারতী
প্রশ্নোত্তর	১৩২২	ভাণ্ডার
চৈতন্য চুটকি	১৩২৩	ভারতী
ভারতীর ছবি	১৩২৩	ভারতী
শিব সদাগর	১৩২৫	আগমনী
মাতৃগুপ্ত	১৩২৫	ভারতী
চাঁইদাদার গল্প	১৩২৫	শারদীয় দেশ
কাষ্ঠবেড়ালের পুঁথি	১৩২৫	মৌচাক
আলপনা	১৩২৫	পার্বনী
রূপ-রেখা	১৩২৫	ভারতী
শিল্প ও শিল্পী	১৩২৫	ভারতী
পাটেল-বিল	১৩২৫	সবুজপত্র
তোরমান	১৩২৬	ভারতী
কোটরা	১৩২৬	ভারতী
গঙ্গাফড়িং	১৩২৭	পার্বনী
জেন্তসভা বা জন্তুজাতীয় মহাসমিতি	১৩২৭	ভারতী
রস ও নীরস	১৩২৭	ভারতী

রচনার শিরোনাম	বঙ্গাব্দ	সাময়িক পত্রের নাম
বারোয়ারি উপন্যাস	১৩২৭	ভারতী
রং-বেরং	১৩২৭	ভারতী
নোয়ার কিস্তি	১৩২৭	ভারতী
রাসধারী	১৩২৭	পার্বণী
ধরাপড়া	১৩২৮	শিক্ষক
আলো আঁধারে	১৩২৮	ভারতী
অবনীন্দ্রবাবুর পত্র	১৩২৮	ভারতী
শিল্পের অন্ধকার যুগ	১৩২৮	প্রবর্তক
বাণী ও বীণা	১৩২৮	প্রবর্তক
দেবীর বাহন	১৩২৮	ইতিহাস ও আলোচনা
চিঠি	১৩২৯	বুধবার
সত্যেন্দ্র	১৩২৯	ভারতী
সংগীতের পথ	১৩২৯	ভারতী
আলাসি	১৩২৯	প্রবর্তক
হাঁসুলি কি ফাঁসুলি	১৩২৯	ভারতী
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আর্ট	১৩২৯	প্রবর্তক
হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষ যাত্রা	১৩২৯	রংমশাল
বাতাপি রাক্ষস	১৩২৯	মৌচাক
আলোয় কালোয়	১৩৩০	মৌচাক
কারিগর ও বাজিকর	১৩৩০	প্রাচী
এসপার-ওসপার	১৩৩০	ভারতী
উৎসবের কনসার্ট	১৩৩০	প্রবাসী
দর্শন-দরবাজা	১৩৩০	ভারতী
শিল্প	১৩৩০	প্রাচী
কারুছত্র	১৩৩০	অয়ন
রীতিমতো শিল্পশিক্ষা	১৩৩০	তরুণ
ছেলেমানুষী বিদ্যে	১৩৩০	ভারতী
পূর্ণিমা ব্রত	১৩৩০	ভারতী

রচনার শিরোনাম	বঙ্গাব্দ	সাময়িক পত্রের নাম
রস ও রচনার ধারা	১৩৩০	বঙ্গবাণী
উজোর ঘরের কান্না (খাসিয়াগাথা)	১৩৩০	কল্লোল
ছেলে ভোলানো ছড়া	১৩৩০	ভারতী
উন্নতি ও পরিণতি	১৩৩১	মহিলা
নাচ ঘরের আবহাওয়া	১৩৩১	নাচঘর
বাংলা থিয়েটারের একটুকরো	১৩৩১	নাচঘর
বড়ো রাজা ছোট রাজার গল্প	১৩৩২	মৌচাক
কনকলতা	১৩৩২	মৌচাক
শিল্পের 'ক' ও 'খ'	১৩৩২	বার্ষিক বসুমতী
রূপ-রেখার রূপকথা	১৩৩২	প্রবাসী
দোতারা	১৩৩২	উত্তরা
বড়ো জ্যাঠামশাই - ১	১৩৩২	ভারতী
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৩২	বঙ্গবাণী
আশুতোষ	১৩৩২	বঙ্গবাণী
জগদিন্দ্রনাথ স্মরণে	১৩৩৩	মানসী ও মর্ম্মবাণী
আর্টের সহজ পথ	১৩৩৩	উত্তরা
ভারতীয় শিল্প-কলার জন্ম	১৩৩৩	উত্তরা
কোণের ঘর	১৩৩৩	বার্ষিক বসুমতী
সাথী	১৩৩৩	বার্ষিক শিশুসাথী
ভোম্বলদাসের কৈলাসযাত্রা	১৩৩৩	মৌচাক
রতা শেয়ালের কথা	১৩৩৩	মৌচাক
আর্টিস্ট	১৩৩৩	ভারতী
রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট	১৩৩৩	শান্তিনিকেতন
শিক্ষা ও পরীক্ষা	১৩৩৩	ভারতী
রাজ্যাভিষেক	১৩৩৩	মৌচাক
দেয়ালা	১৩৩৪	মৌচাক
মহামাস তৈল	১৩৩৪	বেণু
বাবুই পাখির ওড়ন বৃত্তান্ত	১৩৩৪	বেণু

রচনার শিরোনাম	বঙ্গাব্দ	সাময়িক পত্রের নাম
এম্. এ. আর্টিস্টের প্রশ্নমালা	১৩৩৪	কল্লোল
রসসৃষ্টি	১৩৩৪	নাচঘর
নতুন ও পুরোনোর দ্বন্দ্ব	১৩৩৪	উদয়ন
আষাঢ়ে গল্প	১৩৩৭	বার্ষিক শিশুসাথী
খোকাখুকি	১৩৩৭	খোকাখুকু
যাত্রা ও থিয়েটার	১৩৩৮	জয়ন্তী উৎসর্গ
ব্যাপটাইজ	১৩৩৯	ল কলেজ ম্যাগাজিন
শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু	১৩৩৯	বিচিত্রা
বাংলার রঙ ও রূপ	১৩৩৯	বিচিত্রা
নূতনে পুরাতনে	১৩৪০	উদয়
উড়ো-চিঠি	১৩৪০	নাচঘর
ই. বি. হ্যাভেল	১৩৪১	প্রবাসী
সোকার ঘটকালী	১৩৪৩	বঙ্গলক্ষ্মী
সিকস্তি পয়স্তি কথা	১৩৪৪	রংমশাল
ভবের হাটে হেতি হোতি	১৩৪৪	পাঠশালা
হেতি হোতির বৃত্তান্ত	১৩৪৫	সোনার কাঠি
বড়ো জ্যাঠামশাই - ২	১৩৪৬	ভারতী
শিল্পীর খেয়াল	১৩৪৬	শারদীয় আনন্দবাজার
আবহাওয়া	১৩৪৮	শনিবারের চিঠি
শিশুদের রবীন্দ্রনাথ	১৩৪৮	রংমশাল
রেনি ডে	১৩৪৯	মধুমেলা
ফার্স্ট টু লাস্ট	১৩৪৯	শনিবারের চিঠি
হারজিৎ	১৩৪৯	পাঠশালা
দুই সন্ধানী	১৩৪৯	বিশ্বভারতী পত্রিকা
আর্ট প্রসঙ্গ	১৩৪৯	বিশ্বভারতী পত্রিকা
উড়নচণ্ডীর পালা	১৩৪৯	শারদীয় আনন্দবাজার
আমাদের সেকালের পুজো	১৩৪৯	শারদীয় আনন্দবাজার
আমাদের পারিবারিক সংগীতচর্চা	১৩৫০	গীতবিতান

রচনার শিরোনাম	বঙ্গাব্দ	সাময়িক পত্রের নাম
ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ	১৩৫০	প্রবাসী
মউর ছালের পালা	১৩৫০	দিগন্ত
কঞ্জুষের পালা	১৩৫০	রংমশাল
টুকরি বুড়ি	১৩৫০	শারদীয় আনন্দবাজার
বহিত্র	১৩৫১	দেশের মাটি
গজ-কচ্ছপের পালা	১৩৫১	শারদীয় দেশ
মৌচাক মেলা	১৩৫১	মৌচাক
ভূতপতরীর যাত্রা	১৩৫১	রংমশাল
আলিপনা	১৩৫২	বিশ্বভারতী পত্রিকা
শিশু বিভাগ	১৩৫২	পঁচিশে বৈশাখ
গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত	১৩৫২	দেবালয়
রতনমালার বিয়ে	১৩৫২	শারদীয় আনন্দবাজার
নেই ও আছে	১৩৫৩	রংমশাল
ধেড়ো কাক বুড়ো শেয়ালের পালা	১৩৫৩	আকাশদীপ
সিন্ধবাদ বিবরণ পদ্য	১৩৫৩	সপ্তডিঙা
কলাবনের কলা	১৩৫৪	শারদীয় দেশ
হারানিধি	১৩৫৪	অঞ্জলি
বেনুকুঞ্জের পালা	১৩৫৫	শারদীয় দেশ
লম্বকর্ণ পালা	১৩৫৬	শারদীয় দেশ
ঋষিযাত্রা	১৩৫৭	শারদীয় দেশ
হংসনামা	১৩৫৯	শারদীয় দেশ
এসপার ওসপার	১৩৬০	শারদীয় দেশ
বৃক ও মেষপালা	১৩৬১	শারদীয় দেশ
জাবালির পালা	১৩৬১	শারদীয় দেশ
সূর্য কী করতে এলেন	১৩৬১	সমকালীন
ফসকান পালা	১৩৬৩	জয়যাত্রা
দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা	১৩৬৩	শারদীয় বসুমতী
কাক ও পনীর পালা	১৩৬৩	মৌচাক

রচনার শিরোনাম	বঙ্গাব্দ	সাময়িক পত্রের নাম
শ্রীকৃষ্ণ কথা	১৩৬৩	টুকরো কথা
নল-দময়ন্তী	১৩৬৩	টুকরো কথা
ইচ্ছাময়ি বটিকা	১৩৬৫	রং-বেরং
পুতলির পালা	১৩৬৫	শারদীয় বসুমতী
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চীর পালা	১৩৬৫	মৌচাক
গোল্ডেন গুজপালা	১৩৬৬	দেবদেউল
উপরামায়ণ	১৩৭০	শারদীয় দেশ
ঘোড়া হাটের পালা	১৩৭০	শারদীয় অমৃত
কথামালার দেশে	১৩৭১	শারদীয় অমৃত
অরণ্যকাণ্ড পালা	১৩৭২-৭৩	মাসিক বসুমতী
দুঃসহপালা	১৩৭৩	শারদীয় আনন্দবাজার
কথামালা যাত্রার সঙ	১৩৭৫	লম্বকর্ণপালা

এবারে আসাযাক অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনায়। এই আলোচনাটি লেখকের রচনাগুলির বিষয়বৈচিত্রের ভিত্তিতে করা শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী এগিয়ে যাবে। আমরা প্রথমে আসব কাহিনীকেন্দ্রিক রচনাগুলির আলোচনায়।

কাহিনীকেন্দ্রিক রচনা

শকুন্তলা (১৮৯৫) ঃ

ঠাকুর পরিবার আয়োজিত বাল্য গ্রন্থাবলীর প্রথম বই 'শকুন্তলা' আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম এই সংস্করণ ছিল লেখক কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত। অবনীন্দ্রনাথ সাহিত্য জগতে পা রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। আর তাঁর 'শকুন্তলা' রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা যে কাজ করেছিল সে কথা তিনি 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইতে জানিয়েছেন ঃ

''একদিন আমায় উনি (রবীন্দ্রনাথ) বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম, বাপরে, লেখা - সে আমার দ্বারা কস্মিনকালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই - না; ভাষার কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর

পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা।''[১]

অবনীন্দ্রনাথ এই গল্পের কাহিনী কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক ও মহাভারতের থেকে আহরণ করলেও রূপকথার ঢঙে তাকে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যা আমাদের মনকে নিয়ে চলে যায় রূপকথার মায়াবী জগতে। এ যেন কালিদাসের নাটকের নবরূপায়ণ। কাহিনীর শুরুই হয়েছে রূপকথার ঢঙে —

''এই বনে তিন হাজার বছরের এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় মহর্ষি কণ্বদেবের আশ্রম ছিল। সেই আশ্রমে জটাধারী তপস্বী কণ্ব আর মা গৌতমী ছিলেন, তাঁদের পাতার কুটির ছিল, পরনে বাকল ছিল, গোয়ালভরা গাই ছিল, চঞ্চল বাছুর ছিল, আর ছিল বাকল পরা কতগুলি ঋষিকুমার।''[২]

এই বর্ণনা আমাদের যেন নিয়ে যায় সুদূর অতীতের এক মায়াবী জগতে। গল্পের কাহিনীকে চারটি শিরোনামে চিহ্নিত করে তিনি বর্ণনা করেছেন। সেগুলি হল 'শকুন্তলা', 'দুষ্মন্ত', 'তপোবন' ও 'রাজপুরে'। অনেক দুঃখ কষ্টের পথ অতিক্রম করে শকুন্তলার দুষ্মন্ত লাভ আমাদেরকে রূপকথার জগতের দুয়োরাণীর দুঃখমোচনের গল্পকে মনে করায়। এরই পাশাপাশি রচনাটিতে ফুটে উঠেছে চিত্র শিল্পীর হাতে চিত্রিত গ্রাম বাংলার এক নিপুণ ছবি।

ক্ষীরের পুতুল (১৮৯৬) ঃ

বাল্যগ্রন্থাবলীর তৃতীয় গ্রন্থ হিসাবে ক্ষীরের পুতুল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। 'ক্ষীরের পুতুল' বিশুদ্ধ রূপকথার গল্প। তিনি এর কাহিনীটি পেয়েছিলেন কাকীমা মৃণালিনীদেবীর কাছ থেকে। রূপকথার ধাঁচে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। রাজার দুই রাণী সুয়ো আর দুয়ো। সুয়োরাণী রাজবাড়িতে বড় আদর, আর দুয়োরাণীর বড় অযত্ন। এই দুয়োরাণী কিভাবে পোশা বানরটির কৌশলে স্বামীর আদর লাভ করল এবং মা ষষ্ঠীর কৃপায় সোনার চাঁদ পুত্র লাভ করল তাই অনবদ্যভাবে বলা হয়েছে এই গল্পে। এরই পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন ছড়ার চিত্রকল্প।

''এই 'ক্ষীরের পুতুল' বইটি নানা ভাষায় অনুদিত হয়। এই অনুবাদগুলির একটি বিবরণ নিচে দেওয়া হল ঃ

ইংরেজী ঃ The Cheese Doll.tr. Nilima Devi, Signet Press, Calcutta, 1945. Caramel Doll.tr. Bishnu Dey and Pranati Dey, Kutub, Bombay, 1946.

ফরাসী ঃ La Poue'e de Fromage, tr. Andre'e Karpeles and Amiyachandra Chakravarty, Publications Chitra Alpes-Martimes, 1933.

সুইডিশ ঃ Ostdockan, tr. Ella Myrin Hillbom, Stockholm, 1949.

হিন্দী ঃ Khoyc Ki Gudiya, Signet Press, Calcutta, 1945. Khir Ki Gudiya, tr. Maya Gupta Publications Division, Government of India, 1957.

মারাঠী ঃ Bahula Nawana, tr. Venkates Vakil, Yugavani Prakasan, Bombay, 1949.

ফরাসী অনুবাদটির দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে। ফরাসী এবং সুইডিশ অনুবাদে যুক্ত ছিল Selma Lagerlof লিখিত একটি ভূমিকা।''[৩]

রাজকাহিনী (১৯০৯) ঃ

'' 'রাজকাহিনী' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে হিতবাদী লাইব্রেরী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম খণ্ডের অন্তর্গত ছিল ঃ শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী। বইটির দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রকাশক ছিলেন গ্রন্থবিহার। এই খণ্ডের অন্তর্গত হয় ঃ হাম্বির, হাম্বির (রাজ্যলাভ), চণ্ড, রানা কুম্ভ, সংগ্রাম সিংহ। পরে খণ্ড দুটি একসঙ্গে প্রকাশ করেন সিগনেট প্রেস। ... ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজকাহিনী'র গুজরাটী অনুবাদ প্রকাশ করেন আমেদাবাদের কলম প্রকাশন মন্দির, অনুবাদ করেন রসনলালাা সোনী।''[৪]

'রাজকাহিনী' গল্পগুলির উৎস তিনি পেয়েছিলেন কর্ণেল টডের 'Annals and Antiquitics of Rajasthan' থেকে। অবনীন্দ্রনাথের হাতে টডের রাজস্থানের কাহিনী নতুন রূপ পেয়েছিল। ইতিহাসের চরিত্রেরা তার কলমে রূপকথার জগতের মানুষে বদলে যায়। মেবারের রাজবংশের কাহিনীই 'রাজকাহিনী'-র বিষয়বস্তু। তবে 'রাজকাহিনী'তে টডের লেখা রাজপুতনার সমস্ত গল্প স্থান পায় নি। শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য, পদ্মিনী, হাম্বির, হাম্বিরের রাজ্যলাভ, চণ্ড, রানাকুম্ভ ও সংগ্রাম সিংহ - মেবার রাজবংশের এই নয়টি কাহিনীই এখানে স্থান পেয়েছে।

শিলাদিত্য ঃ

ব্রাহ্মণ কন্যা সুভাগার সূর্যের বরে প্রাপ্ত পুত্র গায়েব-এর রাজা শিলাদিত্য হয়ে ওঠার কাহিনী এই গল্প। কিছুটা ইতিহাস, কিছুটা লোকশ্রুতি, আর কিছুটা কল্পনা মিশিয়ে তৈরী করলেন 'শিলাদিত্য' গল্পটি। সূর্যের বরে প্রাপ্ত আদিত্যশিলা দিয়ে বল্লভীপুরের রাজাকে হত্যা করে শিলাদিত্য নাম দিয়ে রাজসিংহাসনে বসেন। তারপর একে একে সমস্ত যুদ্ধ জয় করে এগিয়ে গেলেও বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় শিলাদিত্য প্রাণ হারান।

গোহ ঃ

যবনের সঙ্গে যুদ্ধের কিছু দিন পূর্বে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রাণী পুষ্পবতীকে তার বাপমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তারপর যুদ্ধে শিলাদিত্যের মৃত্যুর পর রাণী জন্মদেন এক

পুত্রসন্তান। নাম গোহ। এই গোহ এর ভীলদের রাজা হয়ে ওঠার কথা বর্ণনা করা হয়েছে এই অংশে।

বাপ্পাদিত্য ঃ

বাপ্পাদিত্য গোহার রাজবংশেরই উত্তরসূরী। গোহের সুশাসনে এই বংশের প্রতি ভীলদের রাজভক্তি বেড়ে গিয়েছিল। এই ভক্তি অটুট ছিল কয়েক পুরুষ ধরে। কিন্তু বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য ভীলপ্রজাদের উপর অত্যাচার এতই বাড়িয়ে দেয় তার ফলে ভীলরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। শেষে ভীলদের হাতে নাগাদিত্যের মৃত্যু হয়। শেষে এক ভীলসর্দার রাণী ও বাপ্পাদিত্যকে মারবার জন্য রাজগৃহে এসে পৌঁছলে রাণী তাকে সোনার চাবির গোছা ছুড়ে দিয়ে পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর বীরনগরের কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে রাণী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

এরপর বাপ্পাদিত্যের বড়ো হয়ে ওঠা, খেলাচ্ছলে শোলঙ্কির রাজকন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়। কাহিনীর পরবর্তী অংশে বাপ্পাদিত্য বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেও ভুলতে পারেন নি সেই রাজকন্যাকে। একদিন রাত্রে এক ভিখারিনী কণ্ঠে একটা পুরনো গান শুনে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তার সেই গান শোনবার জন্য তাকে বিয়ে করে সারা জীবন কাটিয়ে দেন।

পদ্মিনী ঃ

ভীমসিংহের পত্নী সিংহলদ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীর রূপের কথা শুনে আলাউদ্দীনের মুগ্ধতা এবং চিতোর আক্রমণ। আর চিতরে সকল কুলবধূ সহ পদ্মিনীর সতীত্ব রক্ষার জন্য জহর ব্রতে আত্মাহুতি — এটাই পদ্মিনীর বিষয়। তবে অবনীন্দ্রনাথ এই গল্পে ইতিহাসের ক্রম সর্বত্র অনুসরণ করেন নি। ইতিহাসের মূল বিষয়কে অপরিবর্তিত রেখে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আবার কাহিনীর বর্ণনার মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন ভীমসিংহের বীরত্ব, আলাউদ্দীন-এর নীচমনোবৃত্তি এবং পদ্মিনীর বুদ্ধির জোরে ভীমসিংহের মুক্তি পাওয়ার ঘটনা।

হাম্বির ও হাম্বিরের রাজ্যলাভ ঃ

যুবরাজ অরিসিংহ ও রাণী লছমীর পুত্র হাম্বির কিভাবে কাকা অজয় সিংহের পুত্র সুজানকে সুকৌশলে হারিয়ে মেবারের রাজমুকুট মাথায় পরেছিল এবং কমলকুমারীর সন্ধান দেওয়া ভবানীর খাঁড়ার সাহায্যে চিতোরের রাজসিংহাসন লাভ করেছিল তার কাহিনীই বর্ণিত হয়েছে। রাজ্য শাসন করতে গেলে বাহুবলই শেষ কথা বলে না, তার সাথে প্রয়োজন রাজনৈতিক বুদ্ধিবল - হাম্বির সেটাও তার কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে।

চণ্ড ঃ

রণমল্লের দূত মাড়োয়ারের রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে রাজকুমার চণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে আসে। মহারাণা লখা সেই রূপোর পাতে মোড়া একটি নারকেল গ্রহণ করলে রাজকুমার চণ্ড রাজকুমারীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। তারপর লখা রানার পুত্র মুকুলের দেখভাল করে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। এই গল্পে রাজকুমার চণ্ডের ত্যাগী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে মুকুলকে সিংহাসনে বসাতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয় মহাভারতের ভীষ্মের মতো।

রানাকুম্ভ ঃ

মুকুলের পুত্র রানাকুম্ভ ও তার স্ত্রী মীরাকে নিয়ে লেখা 'রানাকুম্ভ' গল্পটি। মীরার সাধন ভোজন রানাকুম্ভ পছন্দ না করায় মীরা তাকে ছেড়ে চলে যায়। আবার রানাকুম্ভ বাহুবলে মন্দুরের বিবাহ বাসর থেকে ঝলকুমারীকে তুলে নিয়ে এসে বিয়ে করতে চেয়েছে। 'রানাকুম্ভ' গল্পে বাহুবলের সঙ্গে প্রেমের দ্বন্দ্বে প্রেমেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। একদিকে সে হারিয়েছে রাণী মীরাকে, অপর দিকে অন্যের ভালোবাসা জোর করে পেতে গিয়েও ব্যর্থ হয়েছে।

সংগ্রামসিংহ ঃ

'রাজকাহিনী' গ্রন্থের শেষ গল্প 'সংগ্রামসিংহ'। এই গল্পে দেখানো হয়েছে রাজপুত বীরত্বের কাহিনী। রানাকুম্ভের মৃত্যুর পর মেবারের সিংহাসনে রায়মল্ল বসে শান্তিতে রাজ্য শাসন ও পালন করছিলেন। তবে রায়মল্লের তিন পুত্র - সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ, জয়মল এবং ভাই সুরজমল — সিংহাসন দখল করতে গিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। তবে গল্পে পৃথ্বীরাজের বীরত্ব মনে দাগ কেটে যায়।

ভূতপত্রীর দেশ (১৯১৫) ঃ

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভূতপত্রীর দেশ' প্রকাশ করেন। 'ভূতপত্রীর দেশ' গ্রন্থটি লেখার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজ করেছিল। একথা তিনি জানিয়েছেন তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' - এই বইতে —

''কত বলব সে দেশের ঘটনা। পরপর কত কিছুই না মনে পড়ে — সে বিস্তর কথা। একবার আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম, সেও এক কাণ্ড। পুরীতে অনেক দিন আছি, ভেবেছি সব আমার নখদর্পণে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে চক্রতীর্থ পেরিয়ে গেছি সমুদ্রের ধার দিয়ে, রাস্তা ছাড়িয়ে বালির উপর ধপাস্ ধপাস্ করে চলেইছি। কত দূরে এসে পড়েছি কে জানে। হঠাৎ চটকা ভাঙল, দেখি সূর্যাস্ত হচ্ছে। যে দিকে চাই ধু ধু বালি। না নজরে পড়ে জগন্নাথের মন্দির, না রাস্তা, না কিছু। শুধু শব্দ পাচ্ছি সমুদ্রের। কোন দিকে যাব? ঘোর লেগে গেছে। তারা ধরে চলব, তারও তো কোনো জ্ঞান নেই। একেবারে

স্তম্ভিত। শেষে সমুদ্রের শব্দ শুনে সেই দিকে চলতে লাগলুম। খানিক বাদে দেখি এক বুড়ি চলেছে লাঠি হাতে; বললে, 'কোথায় যাচ্ছ?' বললুম, 'চক্রতীর্থে'। ভাবলুম চক্রতীর্থে পৌঁছতে পারলেই এখন যথেষ্ট। বুড়ি বললে, 'তা যে দিকে যাচ্ছ সে দিকে সমুদ্র। আমার সঙ্গে এসো, আমি যাচ্ছি চক্রতীর্থে'। বুড়ির সঙ্গে চক্রতীর্থে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নয়ত সারা রাত সেদিন ঘুরে বেড়ালেও কিছু খুঁজে পেতুম না। 'ভুতপত্রী' তে আছে এই বর্ণনা।''[৫]

আবার উমাদেবী 'ভূতপত্রীর দেশ' বইটি লেখার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন ঃ ''আর একবার বাবার সঙ্গে পুরী গেছি। সমুদ্রের ধারে 'পাথারপুরী' বাড়িতে তখন ওঁরা গিয়ে থাকতেন। বাড়িটার নাম বাবাই দিয়েছিলেন। সেবার বাবার সখ হল কোনারক দেখতে যাবার। মা জিজ্ঞেস করলেন বাবাকে যে, তিনি একলা যাবেন নাকি! বাবা বললেন যে, মা, আমার মেজো বোন করুণা আর আমিও যাব। সঙ্গে গিয়েছিলেন মূলার সাহেব। ... এই কোনারক যাত্রার পর বাবার 'ভূতপত্রীর দেশ' বইখানি লেখা হয়। এই বইটির মধ্যে যে রোমাঞ্চকর পথের বর্ণনা আছে পাল্কী চড়ে যাবার, সেটা হল কোনারক যাত্রার ভুতুড়ে পথ। যাবার সময় যেমন গা ছমছম করছিল, পড়লেও তেমনি ভয় মেশানো বিস্ময় মনে জাগে।''[৬]

প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ ''রূপকথার জগৎ বিশিষ্টার্থে দেশহীন ও কালহীন বলিয়াই এখানে কিম্ভুত বা আজগুবি-রসের সৃষ্টি এমন সহজ। কিম্ভুত-রস আর কিছুই নয়, জীবনের স্বাভাবিক তাল পরিবর্তনই কিম্ভুত-রস। যে তালে আমরা প্রাত্যহিক জগতে পা ফেলি কিম্ভুত জগতের পা ফেলার তাল তাহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রাত্যহিক দেশ ও কালকে বিদায় করিয়া দিয়া এই স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করা হয়। ... আবার কিম্ভুত-রসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ভূতপত্রীর দেশে, খাতাঞ্চির খাতায়, বুড়ো আংলাতে।''[৭]

'ভূতপত্রীর দেশ'-এ 'কিম্ভুত রস' বা 'আজগুবি রসের' সৃষ্টি হয়েছে। 'ভূতপত্রীর দেশ' এর কাহিনীর নায়ক অবু অর্থাৎ লেখক এর মাসির বাড়ি থেকে পালকি করে পিসির বাড়ি যাবার যাত্রাপথে এসেছে বিভিন্ন উদ্ভট ঘটনা। তারই মাঝে এসেছে হারুন্দে ও কিচ্‌কিন্দের গল্প। 'ভূতপত্রীর দেশ' উলটা-পুরীর দেশ। সেখানে দিনের বেলা চাঁদ ওঠে, রাতে সূর্য্য, চোখ বন্ধ করলে দেখা যায়, চেয়ে থাকলে সব কিছুই আদৃশ্য লাগে, সেখানে পালকি ডাঙাতে চলে না, জলের মধ্যে চলে। এরই পাশাপাশি এই গল্পে এসেছে লোকপুরাণ প্রবাদ, ছড়া কেটে কথা বলার চল। সব মিলিয়ে 'ভূতপত্রীর দেশ' আমাদেরকে নিয়ে যায় বাস্তবের জগৎ থেকে স্বপ্নপুরী লোকে।

নালক (১৯১৬) ঃ

''১৩২২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'নালক'। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নালক' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস। এ বইয়ের একটি ফরাসী অনুবাদ হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।''[৮]

অবনীন্দ্রনাথ গৌতম বুদ্ধের জীবন কাহিনীকে নতুন রূপে উপস্থাপিত করেছেন 'নালক' গল্পে। বর্ধনের বনে দেবল ঋষি নালককে রেখে নবজাত বুদ্ধকে কপিলাবস্তুতে দেখতে চললেন। আর নালক বটতলায় বসে দেখতে লাগল একটির পথ একটি ছবি — বুদ্ধদেবের জন্ম। এরপর নালকের মা নালককে বাড়ি নিয়ে চলে আসে। কপিলাবস্তু থেকে ঋষি ফিরে এসে আবার নালককে তার মায়ের কাছ থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের জন্য নিয়ে চলে যায়। আবার নালক তার ধ্যানের চক্ষুতে দেখতে থাকে বুদ্ধদেবের সিদ্ধলাভের ছবি। শেষপর্যন্ত মায়ের জন্য মন কেমন করায় নালক আশ্রম ছেড়ে নৌকো করে গাঁয়ের পথে চলেছে তার মাকে দেখতে —

''নৌকা যখন নালককে দেশের ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে তখন ভরা শ্রাবণ মাস, ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে, নদীর ধারে ধারে বাঁশ ঝাড়ের গোড়া পর্যন্ত জল উঠেছে। থৈ থৈ করছে জল। খাল বিল খানা-খন্দ ভরে গেছে, ঘাটের ধাপ সব ডুবে গেছে — স্রোতের জলে বর্ষাকালের নূতন জলে। নালক ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছে কত দূর থেকে কার হাতের একটি ফুল ভাসতে ভাসতে এসে ঘাটের এক কোণে লেগেছে; নদীর ঢেউ সেটিকে একবার ডাঙার দিকে একবার জলের দিকে ফেলে দিচ্ছে আর টেনে নিচ্ছে। ... আজ এতকাল পরে সে আবার ওই ফুলটির মতোই ভাসতে ভাসতে তার দেশের ঘাটে, মায়ের কোলের কাছে ফিরে এসে আটকা পড়ল।''[৯]

গল্পের শেষে নালক ফিরে এল তার দুঃখিনী মায়ের কোলে। গল্পটির বেশির ভাগ অংশ জুড়েই অবনীন্দ্রনাথ লেখনীর সাহায্যে ছবি এঁকেছেন। গল্পতে রয়েছে রূপকথার আমেজ।

খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১) ঃ

''অবনীন্দ্রনাথ এই বইটি রচনা করেন তাঁর শিশু জগতের রাজা-রাণী ও বাদশা-বেগমদের জন্য। তাঁর লেখায় কল্পনা অনেক জায়গায় সম্ভব অসম্ভবের সীমা অতিক্রম করেছে, কোথাও কিছুটা কিম্ভুত রসেরও সৃষ্টি করেছে যা কেবলমাত্র শিশুদের জগতেই সম্ভব। 'খাতাঞ্চির খাতা' সুকুমার রায় সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকার বৈশাখ ১৩২৭ - মাঘ সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্র রচনাবলীতে এই বইটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে — 'খাতাঞ্চির খাতা James Mathew Barrier এর Peter Pan গল্পের ভাবানুবাদ।' ১৯২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় উপন্যাসটি।''[১০]

'খাতাঞ্চির খাতা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে ভূদেব চৌধুরী বলেছেন ঃ ''যেমন 'খাতাঞ্চির খাতা' আর 'আলোর ফুলকি' রচয়িতার পক্ষে থেকে দুয়েরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'উপন্যাস' — কিন্তু প্রথমটি প্রধানত 'কিশোরসঞ্চয়ন' হলেও আবেদনে পরেরটি বিশ্বজনীন। এমন নয় যে, 'খাতাঞ্চির খাতা' -য় বৃহৎ বিশ্বমনকে ডাক দেবার কোনো সম্বল শিল্পীর নেই। বরং সেই তাঁর চিরকালের চিত্তসম্পদ নিয়েই খেলেছেন উদ্ভদ কল্পনার এমন মজার খেলা যে, বুদ্ধদেব যাকে বলেছেন নিত্য-জীবন সম্পর্কে 'পরাদৃষ্টি, কেমন যেন তা এলোমেলো হয়ে গেছে, শিশু মনের আগল ভাঙা উদ্‌ভাবনার মধ্যেই যার পরিপূর্ণ আবেদন ঃ সুষুপ্তির ঘনতল হতে মগ্ন চৈতন্যের আভাস শিল্পী যেন টেনে তুলেছেন জেগে থাকার কূলে-কূলে।''[১১]

'খাতাঞ্চির খাতা'-য় কিম্ভুত বা আজগুবি রসের সৃষ্টি করেছেন অবনীন্দ্রনাথ শিশুমনের উপযোগী করে। মনিব খাতাঞ্চি, তার এক মেয়ে সোনা, দুই ছেলে আঙুটি-পাঙুটি, তাদের মা, ভৃত্য সনাতন, বোহিম কুকুর, বেড়াল — প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প এগিয়ে গেছে। এরই মাঝে এসেছে আঙুটি-পাঙুটির মনের মাঝে আবিষ্কৃত পুতুর কথা এবং পতুকে নিয়ে তাদের মা-এর নানা ভাবনা। রচনাংশের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে রয়েছে ছড়া, লোকাচার, বিশ্বাস, পুরাণ ও রূপকথার বিভিন্ন প্রসঙ্গ। আর সব মিলিয়ে গল্পে তৈরী হয়েছে এক আজগুবি রসের কাণ্ডকারখানা।

বুড়ো আংলা (১৯৪১) ঃ

''এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলকাতা। শ্রাবণ ১৩৪৮। প্রচ্ছদ অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত। অন্যান্য চিত্র নন্দলাল বসু অঙ্কিত। 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩২৭-২৮ সালে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত। 'প্রকাশকের নিবেদন' -এ দেখা যায়, 'সুইডেনে বড়দিনের উৎসবের সময় একরকম খড়ের পুতুল দোকানে দোকানে পাওয়া যায়। Nils ও তাঁর হাঁস খড়ের পুতুল হয়ে এক বড়দিনে সুইডেনে যখন বিক্রি হচ্ছিল, অবনীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর এক ফরাসী বান্ধবী শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পুতুল দেখে এই সুন্দর প্রচ্ছদ-পট অঙ্কিত হয়েছে।

Selma Lagerlof (১৮৪৮-১৯৪৯) -এর 'The Wonderful Adventures of Nils' (প্রকাশ ১৯০৭) কাহিনী 'বুড়ো আংলা' রচনার প্রেরণা। সমসময়ে অবনীন্দ্রনাথ পুনর্বার কার্শিয়াং ও দার্জিলিং ভ্রমণে যান। ১৯১৯-২০ সালে তিনি দার্জিলিং-এর বহু দৃশ্য চিত্র এঁকেছেন; সাহিত্য রচনার সেই পাহাড়-প্রবাসের স্মৃতি 'বুড়ো আংলা' গ্রন্থের 'টুং-মোন্নাদা-ঘুম' পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়।

কয়েক বছর পর অবনীন্দ্রনাথ 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রে নতুন গদ্যছন্দ রচনা করেছিলেন; সেই 'পাহাড়িয়া' কবিতাবলীতে যে দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে - 'বুড়ো আংলা' গ্রন্থেও তার

সমসাময়িক চিত্রাবলীতে তার উৎস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। 'বুড়ো আংলা'-র পরবর্তী সিগনেট সংস্করণের প্রকাশ ১৩৬০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রচ্ছদ ছিল শ্রী সত্যজিৎ রায়ের।''[১২]

'বুড়ো আংলা' রচনাংশে ছোট্ট ছেলে হৃদয়ের মানসভ্রমণ দেখানো হয়েছে। এরে রয়েছে মোট ৮টি গল্প — আমতলি, চলনবিল, চকানিকোবর, শৃগাল, হংপাল, টুং-সোন্নাটা-ঘুম, যোগীগোফা, আসামী বুরুঞ্জি। তবে প্রত্যেকটি গল্পকে তিনি একসূত্রে গেঁথে একটি গল্পের মালা তৈরী করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র হৃদয়। যার দুষ্টুমিতে মানুষ থেকে পশুপাখি সবাই অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। তাই কেউ তাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। মা-বাবা ঘরের বাইরে গেলে তাকে তালামেরে বন্ধ করে দিয়ে যায়। একদিন রিদয় ছোট জ্যান্ত গণেশকে ধরতে যায় চিড়িং মাঝ ধরা কুঁড়োজাল দিয়ে। আর তাতেই গণেশ ঠাকুর রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দেন — ''এতবড় আস্পর্দ্ধা! ব্রাহ্মণ আমি, আমার গায়ে চিড়িং মাছের জাল ছোয়ানো! যেমন ছোট লোক তুই, তেমনি ছোটো বুড়ো আংলা যক্ হয়ে থাক।''[১৩]

আর গণেশের অভিশাপে রিদয় বুড়ো আঙুলের সমান ছোট হয়ে গেল। তারপর ইঁদুরের কথামতো রিদয় চলল গণেশ ঠাকুরকে খুঁজতে কৈলাসে। কিন্তু সে তো পথ জানে না। বৃদ্ধ গুগলী তাকে কৈলাশ যাবার পথ বলে দেয়। তারপর রিদয় খোঁড়া হাঁসের সঙ্গে চলে মানস সরোবরে। কেননা তার পরেই আছে কৈলাশ পর্বত। যেতে যেতে রিদয় বিভিন্ন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় আর তার চোখে ধরা পড়ে বাংলার প্রকৃতির সজীব শ্যামল রূপ। এ যেন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের কলমের টানে ছবি ফুটিয়ে তোলার অভিনব প্রয়াস। গল্পের শেষ অংশে বাবা-মায়ের ডাকে রিদয়ের ঘুম ভেঙে যায় এবং সে নিজেকে ঘরের মধ্যে আবিষ্কার করে।

'বুড়ো আংলা' পাঠককে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ এনে দেয় রিদয়ের বাধা-বিপদ সঙ্কুল পথ চলার প্রেক্ষিতে। এই গল্পে রিদয় ছাড়া আর কোন মনুষ্য চরিত্র নেই। সমস্ত গল্প জুড়ে রয়েছে অসংখ্য পশু-পাখি। তারা লোক সাহিত্যের Animals Tale এর মতোই মানুষের মতো আচরণ করে, কথা বলে, এমনকি সংসারও করে। আবার রিদয়ের সংলাপ ছাড়া অধিকাংশ পশু-পাখির সংলাপ পরিবেশন করেছেন ছড়ার আকারে। আবার গল্পের মধ্যে আছে প্রবাদ-প্রবচন এর ব্যবহার।

<u>আলোর ফুলকি ঃ</u>

'' 'আলোর ফুলকি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ সালে। কিন্তু তারও অনেক আগে ১৩২৬ এর বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে এটি প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্ররচনাবলীর গ্রন্থ পরিচয় অংশে এর সম্বন্ধে বলা হয়েছে — ফরাসী লেখখ Edmond-Eugene Rostand (১৮৬৮-১৯১৮) Chanticler নামে একটি রপক কাব্যনাট্য রচনা করেন; চার অঙ্কের এই

নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯১০ -এ এবং ঐ সময়েই মঞ্চস্থ হয়। তার কাহিনী আকারে অনুবাদ করেন ফ্লোরেন্স ইয়েটস্ হস 'The Story of Chanticleer' নামে। 'আলোর ফুলকি' সেই কাহিনীর ভাব অবলম্বনে চরিত্র। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের 'গল্পস্বল্প গ্রন্থমালা - ৪' হিসেবে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ নন্দলাল বসু দ্বারা অঙ্কিত।''[১৪]

লীলা মজুমদার 'আলোর ফুলকি' গল্প সম্পর্কে বলেছেন — ''এমন প্রেমের গল্প বিশ্বসাহিত্যে কমই আছে। কাহিনী নতুন নয়, ফরাসী লেখক এডমন্দ রোস্তাদের গল্পের ভাব নিয়ে লেখা কিন্তু এই ধার করা কাঠামোতেও অবনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ঝলমল করছে। রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে ভরা এ এক অপূর্ব ভালোবাসার কাহিনী। এই বইতে প্রেমতত্ত্বের এমন একটি মর্মান্তিক সত্যের কথা আছে য সব পাঠক হয়েতো সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবেন না। প্রেম হল যৌবনের বিলাস, কিন্তু প্রৌঢ় বয়সের একমাত্র অবলম্বন। যখন বিশ্বের সমস্ত আসক্তির অন্তরের শূন্যতা প্রমাণ হয়ে যায়, তখন প্রেম ছাড়া আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে কোথায়?''[১৫]

আবার বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'সাহিত্য চর্চা' গ্রন্থে 'আলোর ফুলকি' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন — '''আলোর ফুলকি' তে কত কথাই বলা আছে। সুরের বিরুদ্ধে অসুরের চক্রান্ত, আলোর বিরুদ্ধে পিশাচ শক্তির, শিল্পীর নিষ্ঠা, পুরুষের বীর্য, নারীর ছলনা, নারীর ত্যাগ।''[১৬]

'আলোর ফুলকি' তে অবনীন্দ্রনাথ মুরগিদের গল্প শুনিয়েছেন। তার সাথে আছে বিভিন্ন পাখিদের কথা। মোরগ কুঁকড়োর চারটি বউ থাকা সত্বেও তার বুকে বিরাজ করে শূন্যতা। সে বিশ্বাস করে তার ডাক দেওয়া আলোর আহ্বানেই রাত্রির অন্ধকার মুছে গিয়ে ভোরের বেলা প্রকৃতির সর্বত্র আলো ছড়িয়ে পড়ে। কুঁকড়োর এই বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণিত করে দেয় সোনালি বনমুর্গী, তাঁর চোখ আড়াল করে সূর্যোদয়ের মুহূর্তকে পার করে দিয়ে। আবার কুঁকড়ো আলো এনে দেয় বলে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে পেঁচা, বাজ, চড়াই, পোষা মোরগরা। এভাবেই গল্পটিতে এসেছে পশু-পাখিদের মধ্যে প্রেম, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি বিষয়। পশু-পাখিদের মুখ দিয়ে তিনি মানুষের কথা বলিয়েছেন, যা আমাদের লোকসাহিত্যের Annimals Tale এর কথা মনে করায়।

মারুতির পুঁথি ঃ

'' 'মারুতির পুঁথি' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর, ৭ আশ্বিন, ১৩৬৩। প্রকাশ করেন ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। গ্রন্থভুক্ত হবার আগে ১৩৪৪-৪৫ সালের 'মৌচাক' পত্রিকায় রচনাটির ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটে।

পত্রিকায় বা গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি, এমন কিছু অতিরিক্ত অংশ অথবা পাঠান্তর পাওয়া যায়

পুঁথির পাণ্ডুলিপিতে। এর মধ্যে আছে ভূমিকা হিসাবে অভিপ্রেত দুটি পাঠ। এখানে সে দুটি সংকলিত হলো। প্রথমটি এইরকম ঃ

মারুতির পুঁথি
আবিষ্কর্ত্তা পুঁথিকণ্ঠ কলাবিদ্
মূল্য বাঁধা হইলে
মলাটে চাপা থাকিবেক।

যথাচিত উৎসাহ পাইলে এই মারুতির পুঁথির পরে নিকষীর পুঁথি, মন্দোদরীর পুঁথি, বিভীষণের পুঁথি, প্রমিলার পুঁথি, জানকীর পুঁথি, সম্পাতির পুঁথি, লবকুশের পুঁথি ইত্যাদি ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রকাশ্য হইয়া রামাই রামায়ণ ও রাবণাই রামায়ণ নামে দুই খণ্ডে চাপা যাইবে সর্বসত্য সংরক্ষিত হইয়া। নিবেদন মিদং সাধারণ্যে কলিকাতা জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি ৫নং শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলাবিদস্য নববর্ষ ১লা এপ্রেল। ঈষৎ পাঠান্তরে দ্বিতীয়টি হলো ঃ

মারুতির পুঁথি
'সচিত্র'
'কলাবিদ পুঁথিকনী বাবাজী কথিত'
আবিষ্কর্তা অজ্ঞাত ও অখ্যাতনামা
জনৈক ছেলেধরা
বুড়া

সর্ব্বসত্ত্বাধিকারী শ্রীঅবনীন্দ্রনাথঠাকুর ও যে কিনে ফেলে সে মূল্য মলাটে চাপা রইল।

বিজ্ঞাপন লেখকের ঃ এই মারুতির পুঁথি বা কিষ্কিন্ধ্যাই রামায়ণ প্রকাশিত হইল; পাঠকগণের উৎসাহ পাইলে বিভীষণের পুঁথি বা রাবণাই রামায়ণ এবং উর্মিলার পুঁথি বা পাখাই রামায়ণ ক্রমশঃ প্রকাশ্য করিবার ইচ্ছা রহিল।

কিমধিকমিতি
কলাবিদ শ্রীঅবনীন্দ্রনাথঠাকুর শর্ম্মনঃ

কলিকাতা জোড়াসাঁকো
ঠাকুরবাড়ি,
নববর্ষ বৈশাখ ১৩৪৪''[১৭]

'মারুতির পুঁথি' গ্রন্থটি পুঁথির ভঙ্গিতে রামায়ণের গল্প নিয়ে লেখা। এখানে চাঁইবুড়ো পুঁথি

পাঠ করেছেন, আর শ্রোতার দলে আছে চ্যাংড়াবুড়ি, বেঙাচির বাবা, কলাবাহাদুর। ব্রহ্মা কর্তৃক রাবণের বর লাভ, সীতা হরণ, সীতা উদ্ধারের জন্য দেবতাদের বানর রূপে জন্মগ্রহণ, হনুমানের সাগর পাড়ি দেবার ঘটনায় কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। এই কাহিনীর মধ্যেই আবার অবনীন্দ্রনাথ ছড়া, প্রবাদ, ঘুমপাড়ানি গানের ব্যবহারও করেছেন মাঝে মাঝে। সব মিলিয়ে কাহিনীটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

চাঁই বুড়োর পুঁথি ঃ

''এই পুঁথিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে, ৭ আশ্বিন ১৮৮১ সন (১৩৬৬ বঙ্গাব্দে)। প্রকাশক ছিলেন ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। গ্রন্থভুক্ত হবার আগে 'মৌচাক' পত্রিকায় 'পোড়ালঙ্কার পুঁথি' নামে এটি আংশিক মুদ্রিত হয় ১৩৪৬ সালে, বৈশাখ থেকে ভাদ্র এবং অগ্রহায়ণ মাসের ছটি কিস্তিতে রচনাটির পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত। প্রথম ও শেষ অংশটুকু বাদ দিলে রামায়ণের কাহিনীই হোক আর অবনীন্দ্র কল্পনাই হোক, এখানে রাক্ষসদের তথা রাবণের জীবনের বিচিত্র ঘটনা। 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'কে রাবণাই পুঁথি হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।''[১৮]

'চাঁইবুড়োর পুঁথি' গ্রন্থটির কাহিনীও রামায়ণের গল্প থেকে নেওয়া। এখানে পাঠক চাইবুড়ো, আর শ্রোতার দলে আছে চাংড়া বুড়ি, বেঙাচির বাপ, কলাবাহাদুর, দুলুলি, কাবুলী, বেঙির মা। পুঁথিটি শুরু হয়েছে হনুমানের সাগর পাড়ির কথা দিয়ে। তারপর রয়েছে রাবণ রাজার বিভিন্ন দেবতাকে জয় করার কাহিনী, কুবেরকে তাড়িয়ে লঙ্কাপুরী জয়। শেষে হনুমানের রাবণের হাতে ধরা পড়া এবং লেজের আগুন দিয়ে পুরো লঙ্কাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা। এখানেই পুঁথিটির সমাপ্ত। এখানেও অবনীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন প্রবাদ-প্রবচন, আবার চরিত্রেরা কখনো কখনো ছড়া কেটে কথা বলেছে।

হানাবাড়ির কারখানা ঃ

''এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা। কার্ত্তিক ১৩৭০। প্রচ্ছদ ও চিত্র শ্রী অজিত গুপ্ত। 'মৌচাক' পত্রে বৈশাখ ১৩৬১ - কার্ত্তিক ১৩৬১ সংখ্যায় ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হয়। Thomos Ingoldsby ছদ্মনামে Richard Harris Barham (১৭৮৮ - ১৮৪৫) -এর লেখা 'The Ingoldsby Legends of Mirth and Marvels' কাহিনীর ছায়াবলম্বী 'হানাবাড়ির কারখানা'। ভূমিকায় 'খাতাঞ্চির খাতা'র চরিত্রগুলির পুনরুল্লেখ লক্ষণীয়। রচনা সম্পর্কে শ্রী শোভনলালা গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি কথায় রয়েছে 'অনেকদিন পরে দাদামশায় Ingoldsby Legend বলে একটি বই থেকে কতকগুলি গল্প নিজের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। লেখাটি আগাগোড়া গদ্যের ছাঁচে লেখা হলেও বাক্যের শেষে প্রায়ই একটা মিল আছে। দাদামশায় বলতেন, এগুলো পড়তে হলে শুধু গল্পের মতো একটানা পড়ে গেলে হবে না। এগুলো আসলে কবিতা — ঠিক ছন্দ রেখে ঠিক সুরে এগুলো পড়লে তবেই এর

রস পাওয়া যাবে। দাদামশায় পড়ে শোনাচ্ছেন, আমরা শুনছি আর দেখছি বাঁ-হাতে লেখার খাতাটা ধরা — ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে লম্বা লম্বা আঙুলগুলো বাতাসে নেড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঝড়ের ঝাপটায় সমস্ত কিছু দুলছে এপাস ওপাশ।' ''[১৯]

খাতাঞ্চিমশায় চাকর সনাতনকে তার শ্বশুরবাড়ি দুপুলিয়ার রাজবাড়ি, যা হানাবাড়ি নামে পরিচিত তার গল্প শোনায়। খাতাঞ্চি এবং একে একে জীবন গোঁসাই, জগদ্রাম মুনশি, ঢোলারাম চণ্ডু হানাবাড়ির কারখানার আলোচনা শুরু করে। মোট সাতটি গল্প নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। গল্পগুলি হল — ফুলবউ, আঁধার, কোটা, দাদাশ্বশুরের ঘড়ি, পুঁটেরাণীর মঠ, দেয়ানের চটি, ছিটওয়ালা কাক, গুমগুমি। কোনো কোনো গল্পে এসেছে অদ্ভুতুড়ে প্রসঙ্গ। গদ্যে রচিত হলেও চরণের শেষে রয়েছে মিল। এর সাথে সাথেই রচনাটিতে রয়েছে প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, লোক বিশ্বাস সংস্কারের প্রসঙ্গ।

মহাবীরের পুঁথি ঃ

''১৩৪৮ সালের আশ্বিন থেকে ১৩৫০-এর ভাদ্র পর্যন্ত কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে 'রংমশাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'মহাবীরের পুঁথি'। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ১৩৭৩ সালের মহালয়ায়।''[২০]

'মহাবীরের পুঁথি' ও রামায়ণের গল্প থেকে নেওয়া। এখানেও চাঁইবুড়ো পাঠক, আর শ্রেতা মামচি, চাঁমচি, খাম্‌চি আর খেমচি। পুঁথিটি একুশটি অংশে বিভক্ত। কাহিনীটিতে আছে রামের রাবণ বধের জন্য লঙ্কায় যাত্রা। নল-নীল ও বানরের সাহায্যে রামের সাগর বন্ধন এবং বিভীষণের সহায়তায় একে একে রাম-লক্ষ্মণের দ্বারা লঙ্কার বীরদের পতন দেখানো হয়েছে।

বাদশাহী গল্প ঃ

''প্রকাশ ভবন, কলিকাতা ১৩৭৮। প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা শ্রী অজিত গুপ্ত। 'বাদশাহী গল্প ও চট্‌জলদি কবিতা' যুক্তভাবে মুদ্রণ করেন প্রকাশ ভবন। ... 'বাদশাহী গল্প'-র গল্পগুলি 'রংমশাল' পত্রের বৈশাখ ১৩৪৫ সংখ্যা থেকে আষাঢ় ১৩৪৬ সংখ্যা পর্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। 'বাদশাহী গল্পকে ভূতপত্রীর গল্পের ক্রমানুবৃত্তি বলা যায়। গল্পগুলিতে অবনীন্দ্রনাথের শৈশবস্মৃতির সঙ্গে জড়িত একাধিক চরিত্রের উল্লেখ আছে।''[২১]

রচনাটি সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন — ''এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে শেষ জীবনের লেখা 'বাদশাহী গল্প' গুচ্ছের কথা মনে পড়ে। বাদশাহ অবনীন্দ্রনাথের নাতির নাম - অলকেন্দ্র-র দ্বিতীয় পুত্র সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গল্পের মধ্যে নিজেকে, নিজের মনকে আষ্টেপৃষ্ঠে না জড়ালে, বলেছি, অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি চলে না, এখানেও নাতি 'বাদশা'-র অস্তিত্বকে

সামনে ধরে গল্পের 'থীম' হয়ে দেখা দিয়েছে দাদু অবনীন্দ্রনাথের অদ্ভুতুড়ে মন। বাইরের দিক থেকে দেখলে সেই 'ভুতপত্‌রী'র ছাঁচ, আসলে বুনোট কিন্তু আলাদা রকমের। সে পার্থক্য শিল্পীর বয়োধর্ম এবং মেজাজের।''[২২]

'বাদশাহী গল্প'-এ অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নাতি 'বাদশা' কে গল্প শুনিয়েছে। আবার নাতিও কখনো কখনো গল্প শুনিয়েছে তাঁকে। গ্রন্থটি দশটি অংশে বিভক্ত। এসেছে বিভিন্ন স্বাদের গল্প। ভূতপত্‌রীর দেশ ছাড়িয়ে অন্যত্র যাওয়ার কথা, অবনীন্দ্রনাথের বিয়ের কথা, ছেলেবেলার স্কুল জীবন, চেপটা-মাথা চট-হলদীর গল্প, ঘটির ঢাকা হারিয়ে যাওয়া প্রভৃতি গল্প। কোনো কোনো গল্পে তাঁর অদ্ভুতুড়ে মনের প্রকাশ ঘটেছে। এরই সাথে এসছে পুরাণ প্রসঙ্গ, ছড়া কেটে কথা বলা, লোক বিশ্বাস-সংস্কারের ঘটনা। নাতি 'বাদশা'র নানা জিজ্ঞাসা যেন অবনীন্দ্রনাথেরই জিজ্ঞাসার নামান্তর — তা বুঝে নিতে ভুল হয় না।

দেবীপ্রতিমা ঃ

''গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩০৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সুধীর চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ' বইটিতে সংকলিত হয়েছে 'দেবীপ্রতিমা'। 'দেবীপ্রতিমা' বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন একবার ঃ আমাদের রবিকাকা বললেন, অবন, তোমাকেও কিছু লিখতে হবে। কিছুতেই ছাড়বে না। আমি খামখেয়ালিতে প্রথম পড়ি 'দেবীপ্রতিমা' বলে একটি গল্প। পুরানো 'ভারতী' তে যদি থেকে থাকে খোঁজ করলে পাওয়া যেতে পারে। রবিকাকা আমাকে প্রায়ই বলতেন, অবন, তোমার সেই লেখাটি কিন্তু বেশ হয়েছিল।

(ঘরোয়া, অবনীন্দ্র-রচনাবলী ১, প্রথম সং, পৃঃ ১৪৫)''[২৩]

'দেবীপ্রতিমা' গল্পটি সাধু ভাষায় লেখা। এখানে গুরু ও শিষ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। একদা গুরু তাঁর শিষ্যের হাতে লোকলোকেশ্বরী দেবীর আরাধনার ভার তুলে দেয়। শিষ্য সেই দেবীর আরতি করার পর তার মধ্যে এক প্রেমময়ী মানবীর সন্ধান পান। তার সঙ্গে চলে শিষ্যের প্রণয়ালাপ। শেষে তাঁর অনুভব 'আর বুঝিলাম সে একই দেবতা, কোথাও লোকেশ্বরী কোথাও হৃদয়েশ্বরী।'

চাঁদনি ঃ

১৩০৬ বঙ্গাব্দে গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্প এসেছে রূপকথার আবহ। নিঃসন্তান ব্রহ্মাণ-ব্রাহ্মণী এক সাধুর কথা মতো চান্দ্রায়ণ করে চাঁদের কণার মতো মেয়ে পায়, তার নাম রাখেন 'চাঁদনি'। সেই 'চাঁদনি'র বিয়ে হয়ে চন্দ্রালোকে চলে যাওয়া এবং মা-বাবার সাথে মিলন ও তাদেরকে চন্দ্রালোকে নিয়ে যাওয়া — এই ভাবে গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

কানকাটা রাজার দেশ ঃ

'রং-বেরং' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি প্রথমে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে ও ছবি' তে প্রকাশিত হয়েছিল। কানাকাটা দেশের কানাকাটা রাজার গল্প। একমাত্র রাজারই দুটি কান ছিল। পরে তার এক কান হনুমান ছিঁড়ে দেয়। শেষে অশ্বত্থ গাছের দৌলতে আবার সে কাটা কান ফিরে পায়। এভাবেই গল্পটির শেষ হয়েছে। গল্পটির সূচনা অংশে আছে রূপকথার ঢঙ। রয়েছে ছড়া ও প্রবাদের ব্যবহার।

আলেখ্য ঃ

''মোগল উপাখ্যান নিয়ে লেখা গল্পটি ১৩১২ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এর ভাষারীতি সাধু। বিষয় এবং ভাষা উভয় দিক থেকেই স্বতন্ত্র বলে 'রাজকাহিনী'-র অন্তর্ভুক্ত হয়নি।''[২৪]

জাহাঙ্গীর ও প্রথম জেমসের রাজদূত রো সাহেবের মধ্যে কথোপকথন এই গল্প। রো সাহেব একটি বিলাতি চিত্র দেখিয়ে তাঁকে বলে ভারতে এমন চিত্র নাই। শেষে তারই মত এক নকল চিত্র প্রস্তুত করলে রো ভারতের চিত্রেরই জয় হয়েছে বলে জানায়।

গঙ্গা-যমুনা ঃ

'' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটিতে ভাষায় সাধুরীতির ব্যবহার শিল্পী করেছেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিথ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পটি মনে করিয়ে দেয়। অতি প্রাকৃত রসের গল্প। পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে পুরাতন সমাধি ক্ষেত্র ঘিরে শিল্পীর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল — তারই বিবৃতির আকারে গড়া।''[২৫]

পশ্চিমে বেড়াতে গিয়ে কবরের ধারে বসে লেখকের রাত্রিজাগরণ এবং প্রেতাত্মার সঙ্গে কথোপকথন ব্যক্ত হয়েছে। শেষে সকাল হলে তিনি দেখেন সেখানে দারাগঞ্জের ডাক্তার সাহেব উপস্থিত হয়েছে।

আইনে চীন্ ই ঃ

গল্পটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আইনে চীন্ ই অর্থাৎ চীনের আয়না। গল্পে ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নেসার রূপের অহংকার এবং শেষমেষ যোধপুরের বৌরানীর রূপের কাছে তার পরাজয় দেখানো হয়েছে।

জয়শ্রী ঃ

'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত। কাশ্মীর রাজ রাজমিহিরের হিংস্র নৃশংস রূপ আলোচ্য গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি দোল পূর্ণিমায় রঙ খেলার পরিবর্তে অন্তঃপুরচারিকাদের রক্ত খেলায় মেতে উঠেছিলেন। আর তাতে রাজার সিংহলবাসিনী রাণী জয়শ্রীরও প্রাণ যায়।

সূত্রপাত ঃ

গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কাশ্মীর রাজ চন্দ্রাপীড়ের মানবিক ওদার্যের দিকটি এই গল্পে প্রকাশিত হয়েছে। চর্মকারের জমিতে ত্রিভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণে বাধা পেয়ে রাজা তার উপর ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নি।

বাপুষ্টা ঃ

'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। খাজনা আদায়ের নিমিত্তে লেখকের কাশ্মীরের বাপুষ্টা বনে অবস্থান, সেখানের অপরূপ প্রাকৃতিক শোভা এবং দুর্ভিক্ষে চাষীদের দুরবস্থার জন্য খাজনা অনাদায় — এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

উদয়াস্ত ঃ

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এই গল্পটি। বৃদ্ধ কাশ্মীরপতির পুত্র শ্রীহর্ষের কাশ্মীরের রাজসিংহাসন লাভ এবং শেষে ঘাতকের দ্বারা মৃত্যুর কথা গল্পে দেখানো হয়েছে।

যুগ্মতারা ঃ

১৩২০ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। নাদির শাহ কর্তৃক মহম্মদ শাহের যুদ্ধে পরাজয় এবং শেষে মহম্মদ শাহের মুহুরী ও চিত্রকর সালেবেগ এর দ্বারা নাদির শাহের হত্যা আলোচ্য গল্পের বিষয়।

গোরিয়াঁ ঃ

গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গৌড় রাজবংশের কন্যা গৌরীর গোরিয়াঁতে পরিণত হওয়ার কথা লেখক স্বপ্নবিষ্ট হয়ে শুনেছিলেন।

চৈতন্য চুটকি ঃ

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। এক বড়লোকি হুজুরের পাখির গান শোনার ইচ্ছার কাহিনী আলোচ্য গল্পে আছে। তার কর্মচারীরা বন থেকে নিয়ে

এসে হাজির করে ব্যাঙ ও বাছুর, পাখি ভেবে। শেষমেষ ছোটো জাতের একটি মেয়ে হুজুরের মজলিসে হাজির হয়, যার গলায় রয়েছে পাখির গানের সুর।

মাতৃগুপ্ত ঃ

১৩২৫ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য গল্পে হর্ষবর্ধনের সভাকবি মাতৃগুপ্তের দুঃখময় জীবন এবং শেষে হর্ষবর্ধনের দ্বারা মাতৃগুপ্তের কাশ্মীরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর কিছুদিন পর হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হলে মাতৃগুপ্তও সিংহাসন ছেড়ে বারানসীর পথে গমন করে।

চাঁইদাদার গল্প ঃ

'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দে গল্পটি প্রকাশিত হয়। পরে এটি 'রং-বেরং' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্পে অবুচন্দ্রর চাঁইদাদাকে লেবু দিয়ে তার কাছ থেকে রাজার ঘরের মটকায় শকুন পড়ার কলে কী কী ঘটনা ঘটেছিল তার গল্প শুনেছে।

কাষ্ঠ-বিড়ালের পুঁথি ঃ

'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে কাষ্ঠ বিড়ালের কাছে রামচন্দ্র সাগর পার হওয়া পথ জানতে চেয়েছে। কাষ্ঠ বিড়াল রামকে তাঁর নাম লেখা পাতা ভাসিয়ে দিতে বলেছে, সেই রামনামের ভেলায় সবাই পার হয়ে যাবে বলে কাষ্ঠ বিড়ালের বিশ্বাস।

তোরমান ঃ

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। কাশ্মীর থেকে তোরমানি টাকা কিভাবে দেশ ছাড়া হয়ে গিয়েছিল তার গল্প লেখক পণ্ডিতদের কাছে শুনেছিলেন।

কোটরা ঃ

'কোটরা' গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরী বলেছিলেন — ''আর 'কোটরা' ছোটে গল্পের সাধারণ পরিসর পেরিয়ে গেছে কেবল আদিম জীবনের রূপ-রস সংগ্রহ করতে করতেই — তবু শেষ পর্যন্ত গিয়ে হল ইচ্ছা পূরণের এক নিটোল রূপকথা। রূপকথার মত স্বপ্ন ভরোভরো, রূপকথার মতই বাস্তবের প্রতি পাশ ফিরে বসা অবাস্তব পরি নামের গল্প। ..... 'কোটরা' গল্প বাস্তব পরাবাস্তব মেশানো অবনীন্দ্র দৃষ্টির এক অতি সার্থক শিল্প উদাহরণ।''[২৬]

'কোটরা' গল্পটি যেন এক গবীর মাঝির সুখ-দুঃখের কথামালা। মাচারু, জুমনী ও তাদের তিন ছেলে নিয়ে তাদের পরিবার। সেখানে মাচারু, নোটো নামে এক বালক, সেই বালকের বেড়ে ওঠা, তারপর তার নিজের বাবার কাছে ফিরে যাওয়া, পরিশেষ মাচারুর মেয়ে লছমীর সঙ্গে নোটোর বিবাহ — এভাবেই গল্পটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

গঙ্গাফড়িং ঃ

১৩২৭ বঙ্গাব্দে 'পার্বণী' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটি 'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এক কুঁড়ে গঙ্গাফড়িং এর কথা গল্পে বলা হয়েছে। যে খাবার সংগ্রহ না করে গান গেয়ে কাটাত। তাই যখন খাদ্য সংকট দেখা দেয় তখন পিঁপড়েদের কাছে খাবার চাইতে গেলে তারা তাকে খাবার না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।

জেন্ত-সভা বা জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি ঃ

'রং-বেরং' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য গল্পটির উৎস ফরাসী গল্প। পশু-পাখিদের নিয়ে এক সভার গল্প। জীব-জন্তুরা ঠিক করে তারা মানুষের অত্যাচারে অতিষ্ঠ, তাই তাদের সঙ্গে সখ্য না রেখে তারা বিদ্রোহের পথে যাবে। এটি পশুদের নিয়ে এক প্রকার কৌতুকরসাত্মক গল্প।

বারোয়ারি উপন্যাস ঃ

''১৩২৭ বঙ্গাব্দে তখন 'ভারতী' পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। বৈশাখ থেকে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত ধারানুক্রমে প্রকাশিত হল ১২ মাসে ১২ দফা 'বারোয়ারী উপন্যাস'। প্রতি দফাতেই পৃথক লেখক — একজন যেখানে গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, আরেকজন সেইখান থেকে খেই ধরে আরো কিছু দূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথের গাল্পিক প্রতিভার আর এক নূতন প্রকাশ এখানে। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৭ এর কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের উপন্যাসটি।''[২৭]

গ্রামীণ অভিজাত প্রতাপশালী সমাজের গল্প এটি। সতীশ নামে এক বিবাগী যুবকের কমলমনির সাথে বিবাহ দিয়ে তাকে সংসারে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে তার মা দুর্গামাসি। পরে কমলমনি গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে হারিয়ে যাওয়ার খবরে আবার সতীশের বৈরগ্যের সাধনায় মনস্থির করা এবং শেষে আবার কমলমনির খবর পাওয়ার ঘটনা দিয়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে।

রং-বেরং ঃ

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটি ছয়টি

দৃশ্যে বিভক্ত। এখানে শিব, পার্বতী, ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতার থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা আছে। অভিনয় করেছে পশু-পাখি। এসেছে রূপকথার বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্প, পুরাণ প্রসঙ্গ।

নোয়ার কিস্তি ঃ

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় নাটকটি প্রকাশিত হয়। এই নাটকে ভগবান মনু বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধরে ধর্মশাস্ত্র প্রনয়ণ করতে চায় পৃথিবীর মানুষদের জন্য। তিনি প্রথমে ভেরেণ্ডা সংহিতায় সৃষ্টিতত্ত্ব লিখছেন ভবিষ্যৎ আর্য বংশের জন্য। তারপর নোয়া বলে একটি চরিত্রের বিভিন্ন কার্যকলাপ এর মধ্য দিয়ে হাস্য রসের সৃষ্টি হয়। এখানেও এসেছে পুরাণ এর নানা প্রসঙ্গ।

রাসধারী ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নাটকটি 'পার্বনী' তে ১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত। নাটকটিতে রূপকথার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, এসেছে রূপকথার চরিত্রেরাত্ত। রাসধারী ও ভালুকের সাহায্যে দুয়োরাণী ও তার ছেলেরে দুঃখ কীভাবে দূর হল তারই কথা হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে এই নাটকে।

ধরাপড়া ঃ

নাটকটি 'শিক্ষক' পত্রিকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত এবং 'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। 'ধরাপড়া' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী' গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়। হরিনাম বলা শুক পাখির কথা জানতে পেরে রাজার পাখিটি নেওয়ার তলব এবং রাজার ঘরে গিয়ে পাখির নাম ভুলে যাওয়ায় রাজার পাখিকে ত্যাগ করার ঘটনা দেখানো হয়েছে। পাখিটি তার পূর্বের মালিক গোঁসাই-এর কাছে ফিরে আসে।

আলো আঁধারে ঃ

গল্পটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত। এই নাটকে ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী মালতীর সঙ্গে শাক্ত জমিদারের ছেলে শ্যামাচরণের সম্পর্ক ও তাদের বিবাহ এর ঘটনা আছে। লেখকও ছিলেন এদের সাথী।

দেবীর বাহন ঃ

'রং-বেরং' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি প্রথমে 'দুতিহাস ও আলোচনা' পত্রিকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'ছোটোদের মাধুকরী' পত্রিকায় পূজা বার্ষিকী সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্তৃক পুরীর বিমলাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা, দেবীর বাহন সিংহকে মন্দিরে স্থান না দেওয়ায় দেবীর রাজাকে স্বপ্নদেশ — গল্পের বিষয়।

হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষ যাত্রা ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি 'রংমশাল' পত্রিকায় ১৩২৯ সনে প্রকাশিত। সিন্দবাদ ও হিন্দবাদ দুই ভিন্নধর্মী মানুষের কথা এখানে আছে। সিন্দবাদ বারে বারে যায় সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে দূর দেশে বাণিজ্য করতে, আর হিন্দবাদ শুনে তার কাছ থেকে সেইসব দেশের গল্প ঘরে বসে।

বাতাপি রাক্ষস ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য গল্পে দন্তক অরণ্যের দুই রাক্ষস ইল্বল ও বাতাপি-র দ্বারা ঐ অরণ্যের সমস্ত ঋষিকুমার ও ঋষিদের খেয়ে ফেলা এবং শেষে অগস্ত্য মুনির দ্বারা ঐ রাক্ষস বধের কথা বর্ণিত হয়েছে।

এসপার ওসপার ঃ

১৩৩০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রিকাতে নাটকটি প্রকাশিত হয়। এখানে দুটি দৃশ্যে একটি যাত্রাপালা অভিনয়ের ঘটনা দেখানো হয়েছে। যেখানে এসেছে একাধিক চরিত্র, কাহিনীর অসংলগ্নতা, হাস্যরসের ফুলঝুরি।

আলোয় কালোয় ঃ

'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পটি 'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। সওদাগরের হাতে ধরা পড়া মলয়দ্বীপের এক পাখির বন্দী জীবনের দুঃখ কথা এই গল্পের বিষয়। তার সঙ্গী পাখিটি মলয়দ্বীপে তার বিরহে মারা গেলে, বন্দী পাখিটিও বন্দী দশাতেই মারা যায়।

কারিগর ও বাজিকর ঃ

'রং-বেরং' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই গল্পটি 'প্রাচী' পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পে এক রাজসভায় কারিগর ও বাজিকর এর মধ্যে কাজ নিয়ে লড়াই বেঁধেছিল। শেষ পর্যন্ত বাজিকর অসৎ উপায়ে কারিগরকে পরাজিত করে রাজার কাছ থেকে বাহবা কুড়িয়ে নেয়। কারিগরের কষ্টার্জিত কাজের মূল্য কেউ দেয় না।

বড়ো রাজা ছোটো রাজার গল্প ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই গল্পটি 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বড় রাজা দিগ্বীজয় করে এসেও কিভাবে ছোটো রাজার কাছে যুদ্ধে হেরে যায় তারই কথা আছে গল্পে। গল্পে এসেছে রূপকথার আবহ।

কনকলতা ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই গল্পটি 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পটি রূপকথা জাতীয়। রাজার মন্ত্রীর মেয়ে কনকলতার ঘরবন্দী জীবন এবং শেষে এক রাজপুত্রের সাথে বিবাহ এর কথা দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

কোণের ঘর ঃ

১৩৩৩ বঙ্গাব্দের 'বার্ষিক বসুমতী' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পেও রয়েছে রূপ কথার মত রাজপুত্র ও রাজকন্যার কথা, তাদের সুখ-দুঃখের কথা। বুড়ো হয়ে রাজা তার নাতি নাতনীদের গল্প শোনচ্ছে।

সাথী ঃ

'বার্ষিক শিশুসাথী' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গল্পটি 'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। এই গল্পে তেপান্তরের মাঠে একা দাঁড়িয়ে থাকা এক তালগাছের সাথী বা সঙ্গীকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটি পশুদের নিয়ে গল্প। সিংহির মামা ভোম্বলদাস পিঁপড়েদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে হাত-পা ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া এবং সুস্থ হওয়ার জন্য কৈলাস যাত্রা দিয়ে গল্পের শেষ।

রতা শেয়ালের কথা ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত। পশুদের নিয়ে গল্প। এক রতা শিয়াল গায়ে পোঁচ নীল রঙ মেয়ে রাজা হওয়া এবং শেষে ধরা পড়ে যাওয়ার কথা দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি 'মৌচাক' পত্রিকায় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত। এ গল্পেও পশুদের কথা বলা হয়েছে। মামা ভোম্বলদাসের অবর্তমানে ভাগ্নে সিংহের

রাজা হওয়ার ঘটনা গল্পে আছে।

দেয়ালা ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই গল্পটি ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের 'মৌচাক' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। এই গল্পে অবনীন্দ্রনাথ কলমের আঁচড়ে ছবির পর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। গাছ, আকাশ, বাতাস, মাটি ও ছায়ার মধ্য দিয়ে যে ছবির প্রকাশ তারা একে অপরের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ছবি ফুটিয়ে তোলে।

মহামাস তৈল ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই গল্পটি 'বেণু' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। এক কবিরাজের তৈরী মহামাস তৈল নিয়ে এই গল্প। মধুখাতাঞ্চির ছেলে রামধন সেই তেল বুটে লাগালে পিছলে শয্যাগত হয়ে পড়ে।

বাবুই পাখির ওড়ন-বৃত্তান্ত ঃ

'রং-বেরং' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি 'বেণু' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পিঁপড়ে ও মৌমাছিদের সমাজের গঠন নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে লেখক নানান দেশের সামাজিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

আষাঢ়ে গল্প ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি প্রথমে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে 'বার্ষিক শিশুসাথী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মই বেয়ে সবাই উপরে উঠে গেলেও মই নিজে পারে না সেখানে পৌঁছাতে। এক মই এর এই মনোব্যাথা গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

খোকাখুকি ঃ

'একে তিন, তিনে এক' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত গল্পটি 'খোকাখুকু' প্রত্রিকায় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে এসেছে রূপকথার পরিবেশ। খোকা ও খুকির গল্প, খোকা রাজার ঘরে মানুষ হয়ে রাজপুত্তুর মতো, আর খুকি কাঙালের ঘরে কাঙালিনীর মতো। শেষে কাঙালিনীর সাথে রাজপুত্রের মিলন হয়।

—০—

তথ্যসূত্র

১) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ - ২৬৫।

২) শকুন্তলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ১১

৩) ক্ষীরের পুতুল, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩৭৯-৩৮০।

৪) রাজকাহিনী, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর, ১৯৭৪, পৃঃ ৩৮০।

৫) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৮২।

৬) দেবী উমা, বাবর কথা, মিত্রালয়, ১৯৪১, পৃঃ ১৯-২২।

৭) দে বিশ্বনাথ, অবনীন্দ্র স্মৃতি, করুণা প্রকাশনী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃঃ ৪৬।

৮) নালক, অবনীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, অক্টোবর ১৯৭৪, পৃঃ ৩৮১।

৯) তদেব, পৃঃ - ২৬২।

১০) অবনীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬৮-১৬৯।

১১) চৌধুরী ভূদেব, লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, ৯ আশ্বিন, ১৩৮০, পৃঃ ৭৬।

১২) বুড়ো আংলা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬, পৃঃ ৯৪৯-৪৯৫।

১৩) তদেব, পৃঃ ১৪০।

১৪) অবনীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬৬।

১৫) মজুমদার শ্রীলীলা, অবনীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, ১৩৭৩ বৈশাখ, পৃঃ ৩৩।

১৬) বসু বুদ্ধদেব, সাহিত্য চর্চা, সিগনেট প্রেস, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭২।

১৭) মারুতির পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৪১১ - ৪১২।

১৮) অবনীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৭০।

১৯) হানাবাড়ির কারখানা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৯৫।

২০) মহাবীরের পুঁথি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, আগস্ট ১৯৮৩, পৃঃ ৪২০।

২১) বাদশাহী গল্প, অবনীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), প্রকাশ ভবন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬, পৃঃ ৪৯৫।

২২) চৌধুরী ভূদেব, লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, ৯ আশ্বিন ১৩৮০, পৃঃ ৯৮।

২৩) দেবী প্রতিমা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ২৩০-২৩১।

২৪) অবনীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৬৬।

২৫) তদেব, পৃঃ ১৬৯।

২৬) চৌধুরী ভূদেব, লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, ৯ আশ্বিন ১৩৮০, পৃঃ - ১১৫।

২৭) অবনীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৭৭।

—০—

যাত্রাপালা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গল্প, উপন্যাস জাতীয় সৃষ্টিতে যেমন মগ্ন ছিলেন, তেমনি তাঁর প্রতিভার আর এক দিক প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর রচিত যাত্রাপালাগুলিতে। তাঁর রচিত যাত্রাপালাগুলিকে উদ্ভট রসের আজগুবি কাণ্ড বলে মনে হয়। এই যাত্রাপালা রচনার আগে তিনি ১৯৩০-এ 'আরব্য রজনী'-র সিরিজের ছবি আঁকা শেষ করেন। আরব্য রজনীর গল্পের উদ্ভট রস হয়তো তার যাত্রাপালাগুলোতে প্রভাব ফেলে থাকবে। তাই দেখা যায় ১৯৩০ এর পর প্রায় দীর্ঘ দশ বছর তিনি ছবি আঁকেন নি। তাঁর সৃষ্টিশীল মন তখন অন্য আর্ট সৃষ্টির সাধনায় রত। লিখতে শুরু করলেন যাত্রাপালা। এই সম্পর্কে 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বইতে কিছু তথ্য জানা যায় —

''দশ-এগারো বছর ছবি আঁকি নি। আরব্য উপন্যাসের ছবি সেট আঁকা হলে ছেলেদের বললুম, 'এই ধরে দিয়ে গেলুম। আমার জীবনের সব-কিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।' ব্যস, তার পর থেকেই ছবি আঁকা বন্ধ। কী জানি, কেন মন বসত না ছবি আঁকাতে। নতুন নতুন যাত্রার পালা লিখতুম; ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম, তাদের সাজাতুম, নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম। বেশ দিন যায়।

রবিকাকা বললেন, 'অবন, তোমার হল কী? ছবি আঁকা ছাড়লে কেন?'

বললুম, 'কী জানি রবিকাকা এখন যা ইচ্ছে করে তাই এঁকে ফেলতে পারি; সেইজন্যেই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার জন্য মন ব্যস্ত'।''[১]

আবার যাত্রাপালা লিখতে গিয়ে তিনি দেখলেন ঠিক মনে ধরছে না সেগুলো। তাই তিনি রামায়ণ থেকে সরাসরি যাত্রা না লিখে পুঁথি লেখা শুরু করলেন। হনুমানের পুঁথি, পোড়ালঙ্কার পুঁথি ইত্যাদি। তারপর এইসব পুঁথিকে অবলম্বন করেই তিনি লিখে চললেন বিভিন্ন পালা।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণের কাহিনী অনুসরণে তিনি লিখে ফেললেন 'খুদ্দুরযাত্রা' বা 'খুদিরামলীলা'। পরবর্তী সময়ে তিনি রামায়ণের কাহিনী অনুসরণে বৃহদাকারে একটি যাত্রাপালা রচনা করেন। যা 'যাত্রাগানে রামায়ণ' নামে পরিচিত। 'খুদ্দুরযাত্রা বা খুদিরামলীলা' রচনায় কাহিনীর সাথে সাযুজ্য রেখে তিনি তার পাশে বিজ্ঞাপন বা বই থেকে ছবি কেটে সেঁটে দিয়েছিলেন। তবে এই ছবিগুলি তিনি নিছক ব্যবহার করেন নি। এই ছবি ও লেখার মধ্যে আছে একটি অন্তর্নিহিত সূত্র। এসম্পর্কে বলতে গিয়ে শঙ্খ ঘোষ বলেছেন —

''বাষট্টি থেকে বাহাত্তর বছর বয়স পর্যন্ত খ্যাপামির যে হাওয়ায় ছবির চর্চা থেকে দূরে

সরিয়ে রেখে উদ্ভট লেখার খামখেয়াল নিয়ে মেতে ছিলেন আমাদের এই শিল্পী, তার বহু নিদর্শনের অন্যতম একটি হল 'খুদ্দুর যাত্রা', নাম দেখে এ রকমই ভাবতে ইচ্ছে করে প্রথমে। কিন্তু পাতার পর পাতা উল্টে যেতে যেতে ভেঙে যায় সে ভুল। কেননা, খাতাটি শুধু যে লেখায় ভরা তা নয়, লেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে নানারকম ছবি, গল্পের সঙ্গে যেন তার ধারাবাহিক কোনো চিত্ররূপায়ণ।''[২]

আশ্চর্য ক্ষমতার বলে তিনি রামায়ণের গল্পের সাথে ছবিগুলিকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু মিলেই তা থেমে থাকেনি, তার ছিল একটা অন্তর্নিহিত অর্থ। তাই আমাদের চোখে পড়ে রাম-রাবণের যুদ্ধের হুংকারের পাশে জার্মান সেনানয়কের ছবি। রামের নাগপাশ থেকে মুক্তির পাশে রবিন্‌সন বার্লির বিজ্ঞাপন। তাই এসব দেখে রবীন্দ্রনাথেরও মনে হয়েছিল এসমস্ত 'বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প'। শঙ্খ ঘোষের কথায় — ''কিন্তু এই খাতাখানি দেখে ভাবতে হয় আমাদের, কতটাই-বা এর বিশুদ্ধ পাগলামি, আর কতটাই-বা তেমন অভিনিবেশযোগ্য কারুশিল্প।''[৩]

এছাড়া তিনি বিভিন্ন বই থেকে কাহিনী সংগ্রহ করে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাত্রাপালা রচনা করেছিলেন। যেমন রামায়ণের কাহিন অবলম্বনে 'ঋষিযাত্রা', 'অরণ্যকাণ্ড পালা'। 'গজ-কচ্ছপের পাল'-র কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন 'হিতোপদেশ' এর গল্প থেকে। 'লম্বকর্ণ পালা'-র কাহিনী পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্প থেকে আহরণ করেছেন। আবার 'ভূতপত্‌রীর দেশ' এর কাহিনী নিয়ে তিনি পরবর্তী সময়ে 'ভূতপত্‌রীর যাত্রা' লিখেছিলেন।

যাত্রাগানে রামায়ণ ঃ

'' 'যাত্রাগানে রামায়ণ' বা 'রামচন্দ্রি গীতাভিনয়', পাণ্ডুলিপি থেকে সরাসরি গ্রন্থাকারে ছাপা হয়েছিল ১৩৭৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। প্রকাশক ছিল মিত্র ও ঘোষ। আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদপট। দাম ছিল ন'টাকা। লেখকের দৌহিত্র মোহনলালা গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় এই নতুন ধরনের রচনাটি প্রকাশ করা হয়। নতুন ধরনের রচনা হলেও অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাগানের কোনও কোনও অংশ প্রায় আক্ষরিকভাবে গৃহীত হয়েছে কৃত্তিবাসের রচনা থেকে। সেই মূল রচনার মধ্যে মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের রচনা মিশিয়ে দিয়ে বিশেষ একটা কৌতুকভরা স্বাদ আনবার চেষ্টা করেছেন।''[৪]

অবনীন্দ্রনাথ মাঝে কয়েক বৎসর ছবি আঁক বন্ধ করে দিয়ে যাত্রাপালা রচনায় মন দেন। শ্রীরাণী চন্দ্র তাঁর 'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে জানিয়েছেন — ''অবনীন্দ্রনাথ বললেন, ১৯৩৩ সাল থেকে পুরো দশটি বছর ধরে রামায়ণের যাত্রার পালাই লিখেছি খাতার পর খাতায়। কী করে যে এত লিখতে পারলুম তাই ভাবি। কত কাটাকুটি, কত ফেয়ার কপি করতুম বসে বসে। কত খাতাপত্র চুরিও

হয়ে গেল। বারান্দার টেবিলের উপর পরে থাকত খাতাগুলো, বাড়ি বদল করবার সময়ে দেখি একদিন সে সব উধাও।''[৫]

তবে যাত্রাগান লেখার আগে যে তিনি পুঁথি রচনা করে নিজেকে তৈরী করেছিলেন, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণের বারান্দা'য় আছে সে কথা — ''দাদামশায়ের একটা পুরনো কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছিল। মলাটপত্র ছিঁড়ে গিয়েছিল তার। ধুলো ঝেড়ে সেটাকে বার করলেন, রাধুকে দিয়ে বাঁধালেন সেটা। তারপর সেই রামায়ণের গল্পগুলো একটার একটা যাত্রার ঢঙে লিখে চললেন। লিখতেন, কাটতেন আবার লিখতেন, আর আমাদের পড়ে শোনাতেন। আমাদের বেশ লাগত। কিন্তু দাদামশায়ের পছন্দ হত না কৃত্তিবাসী রামায়ণ থেকে লেখা এই যাত্রাগুলো। শেষে একদিন বললেন, ধরেছি গলদ কোথায় হচ্ছে। পয়ারে লেখা রামায়ণ থেকে সোজাসুজি যাত্রা হবে না। আগে পুঁথির মতো করে রামায়ণ লিখতে শুরু করেছিলেন দাদামশায়। বহুদিন ধরে ধরে পুঁথি লেখা চলল। চাঁই বুড়োর পুঁথি, পোড়া লঙ্কার পুঁথি, হনুমানের পুঁথি, মারুতির পুঁথি, জয়রামের পুঁথি, খুদ্দুর রামায়ণ ইত্যাদি। তারপর এই সব পুঁথি সামনে রেখে রামায়ণ যাত্রা লিখতে শুরু করলেন।''[৬]

অবনীন্দ্রনাথের 'যাত্রাগানে রামায়ণ' সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। বাল্মীকির 'রামায়ণ' লেখার কথা দিয়ে শুরু হয়েছে। এরপর রাবণের বর প্রাপ্তি, অত্যাচার, বিষ্ণুর রাম অবতার রূপে জন্মগ্রহণ, রাম কর্তৃক রাবণ বধ, সীতার বনবাস এবং লব-কুশের সঙ্গে রামের যুদ্ধ — এখানেই কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। তিনি বাল্মীকি 'রামায়ণ', কৃত্তিবাস এর 'রামায়ণ' থেকেও পংক্তি গ্রহণ করেছেন। তার এই রচনাতে উদ্ভট রসেও পরিচয় পাওয়া যায়। এরই পাশাপাশি যাত্রার বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ তুড়িজুড়ির গীত, দোহার, অতিনাটকীয়তা, হাস্যরস, বিবেক চরিত্র, সংগীতের বহুল ব্যবহার তাঁর এই রচনাতে দেখা যায়। আবার স্থানে স্থানে এসেছে ছেলেভোলানো ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার।

—০—

তথ্যসূত্র

১) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ২৯২।

২) ঘোষ শঙ্খ, কল্পনার হিস্টিরিয়া, প্যাপিরাস, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃঃ ৫৯।

৩) ঘোষ শঙ্খ, কল্পনার হিস্টিরিয়া, প্যাপিরাস, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃঃ ৫৬।

৪) অবনীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৮১।

৫) চন্দ্র শ্রীরাণী, শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ, ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, বৈশাখ ১৩৭৯, পৃঃ ৬৯।

৬) গঙ্গোপাধ্যায় মোহনলাল, দক্ষিণের বারান্দা, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃঃ ১৪৮।

—০—

স্মৃতিকথা

ঘরোয়া (১৯৪১) ঃ

'' 'ঘরোয়া' প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের আশ্বিন মাসে। প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী। 'অবনীন্দ্রনাথের কাছে গল্পচ্ছলে অনেক মূল্যবান কাহিনী ও কথা' শুনেছিলেন শ্রীমতী রানীচন্দ্র। সেই সব কাহিনীরই লিখিত রূপ 'ঘরোয়া'। অবনীন্দ্রনাথ এখানে কথক। লিপিকার শ্রীমতী রানীচন্দ্র।''[১]

গ্রন্থ সূচনায় শ্রীমতী রানীচন্দ্র 'ঘরোয়া' রচনার এই ইতিহাস বিবৃত করেন ঃ ''গত পুজোর ছুটিতে গুরুদেব যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অসুস্থ, আমরা অনেকেই সেখানে ছিলুম তাঁর সেবা শুশ্রূষার জন্য। আস্তে আস্তে গুরুদেবের অবস্থা যখন ভালোর দিকে যেতে লাগল সে সময় প্রায়ই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের নিয়ে নানা গল্পগুজব করে আসর জমাতেন। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গী যে না দেখেছে, ভাষা যে না শুনেছে, সে তা বুঝবে না; লিখে তা বোঝানো অসম্ভব। কথায় কী ভঙ্গীতে কোন্‌টাতে রস বেশি বিচার করা দায়। নানা প্রসঙ্গে নানা গল্পের ভিতর দিয়ে অনেক মূল্যবান কথা, ঘটনা শুনতাম। দুঃখ হত, লিখতে জানিনে; তবুও এ-সব অমূল্য কাহিনী কেউ জানবে না, নষ্ট হয়ে যাবে, এ সইতনা — খাতার পাতায় অবসর সময়ে লিখে রেখে দিতুম। আশা ছিল, একদিন একজন ভালো লিখিয়েকে দিয়ে এগুলো সবার সামনে ধরবার উপযোগী করা যাবে।

নভেম্বরের শেষে গুরুদেবকে নিয়ে দলবল শান্তিনিকেতনে ফিরে এল। আমাদের কয়েকজনের মধ্যে সময় ভাগ করা ছিল, যে যার সময়মত গুরুদেবের কাছে থাকি, তাঁর সেবা করি। মাস দুয়েক বাদে গুরুদেব অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন — তখন প্রাই তিনি দক্ষিণের বারান্দায় বসে কবিতা লিখতেন। আমাদের বেশি কিছু করবার থাকত না। কাছাকাছি বসে থাকতুম, সময় মত ঔষুধ-পথ্য খাওয়াতুম। সে সময়ে গুরদেব আমাকে বলতেন, 'রানী, তুই একটু লেখার অভ্যাস কর না। কিছু ভাবিস নে — বেশ তো, যা হয় একটা-কিছু লিখে আন, আমি দেখিয়ে দেব। এই রকম দু-একবার লিখলেই দেখবি লেখাটা তোর কাছে বেশ সহজ হয়ে আসবে। চুপচাপ বসে থাকিস — আমার জন্য কত সময় তোদের নষ্ট হয় — আমার ভালো লাগে না।'

একদিন তাঁকে বললুম, 'নিজে লিখবার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না, ও আমার হবে না। তবে একটা ইচ্ছে আছে — এবারে অবনীন্দ্রনাথের কাছে গল্পচ্ছলে অনেক মূল্যবান কাহিনী ও কথা শুনেছি, যা আমার মনে হয় পাঁচ জনের জনা দারকার, বিশেষ করে শিল্পীদের। সেই লেখাগুলো যদি দেখিয়ে দেন কীভাবে লিখতে হবে, তবে তাই দিয়ে লেখা শুরু করতে পারি।'

গুরদেব আমাকে খুব উৎসাহ দিলেন; বললেন, 'তুই আজই আমাকে এনে দেখা কী লিখে

রেখেছিস।' দুপুরে আমার সেই লেখাগুলোই আর একটু গুছিয়ে লিখে গুরুদেবর কাছে গেলুম। দুপুরে বিশ্রামের পর কৌচে উঠে বসেছেন; বললেন, 'কই, এনেছিস? দেখি।' লেখাগুলো হাতে দিলুম, তিনি আগাগোড়া এক নিঃশ্বাসে পড়লেন। বললেন, 'এ অতি সুন্দর হয়েছে। অবন কথা কইছে, আমি যেন শুনতে পাচ্ছি। কথার একটানা শ্রোত বয়ে চলেছে — এতে হাত দেবার জায়গা নেই, যেমন আছে তেমনই থাক্।' পরে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী 'প্রবাসী'তে সেটি ছাপা হয়।''[২]

'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে (বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৩৭৯) এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী রানীচন্দ্র আরো লেখেন ঃ ''একটানা বেশিক্ষণ পড়তে কষ্ট হয় গুরুদেবের। রোজ কিছুটা করে পড়েন। পড়ার পরে লেখাগুলো তুলে রাখি, পরদিন আবার তাঁকে দিই। যেদিন সবটা পড়া হয়ে গেল — উঠে এগিয়ে এলাম, কাগজগুলোা সরিয়ে নেব - গুরুদেব কোলের উপর রাখা লেখাগুলোর উপর বাঁ হাতখানি চাপা দিয়ে রইলেন। আমি চুপ করে দাঁড়িয় রইলাম। বললেন, রথীকে ডাকো। রথীদাকে ডেকে আনলাম। রথীদা গুরদেবের কৌচের পিছনে এসে দাঁড়ালেন। গুরুদেব বুঝতে পারলেন। সেইভাবে বসেই লেখার কাগজগুলো হাতে নিয়ে ঘাড়ের পাশ দিয়ে পিছন দিকে তুলে ধরলেন। বললেন, প্রেসে দাও। রথীদা লেখাগুলো নিয়ে চলে গেলেন। এই হলো 'ঘরোয়া' বইখানার জন্মকথা।''[৩]

রবীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'-র জন্য ছোটো একটি ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকায় তিনি লেখেন ঃ ''আমার জীবনের প্রান্ত ভাগে যখন মনে করি সমস্ত দেশের হয়ে কাকে বিশেষ সম্মান দেওয়া যেতে পারে তখন সর্বাগ্রে মনে পড়ে অবনীন্দ্রনাথের নাম। তিনি দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দ্রা থেকে আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন। তাকে বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন। আজ সমস্ত ভারতে যুগান্তরের অবতারণা হয়েছে চিত্রকলায় আত্ম-উপলব্ধিতে। সমস্ত ভারতবর্ষ আজ তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাদান গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের এই অহংকারের পদ তাঁরই কল্যাণে দেশে সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করেছে। এঁকে যদি আজ দেশলক্ষ্মী বরণ করে না নেয়, আজও যদি সে উদাসীন থাকে, বিদেশী খ্যাতিমানদের জয় ঘোষণায় আত্মবমান স্বীকার করে নেয়, তবে এই যুগের চরম কর্তব্য থেকে বাঙালী ভ্রষ্ট হবে। তাই আজ আমি তাঁকে বাংলাদেশের সরস্বতীর বরপুত্রের আসনে সর্বাগ্রে আহ্বন করি।

শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ই জুলাই ১৯৪১।''[৪]

'ঘরোয়া' রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন ঃ ''অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে' বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই দুইখানিতে তাঁহার রচনারীতি

পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং এই দুইখানিতে একাধারে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও সামাজিক মানুষ অবনীন্দ্রনাথের জীবনকথা লিপিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা, এবং অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া, জোড়োসাঁকোর ধারে এই চারখানি বইয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায়। যে আবহাওয়ার মধ্যে লোকোত্তর দুইজন মনীষী জন্মিয়াছেন, বাড়িয়া উঠিয়াছেন; যে আবহাওয়ায় তৎকালীন নব্যবঙ্গ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বই চারখানি তাহার ইতিহাস বুঝিতে যেমন সাহায্য করে এমন আর কোথায়?''[৫]

'ঘরোয়া' তে অবনীন্দ্রনাথ কথক, আবার রচনার মধ্যে কথকতা ভঙ্গিও প্রকাশ পেয়েছে। বইখানিতে জোড়াসাঁকোর সামাজিক ইতিহাসের পাশাপাশি অবনীন্দ্রনাথের শৈশবের বিভিন্ন ঘটনা জানা যায়। এক কথায় ব্যক্তি অবনীন্দ্রনাথকেও চিনে নেওয়া যায়। অবনীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল পাকা বাজিয়ে হবার। তার বর্ণনা আছে 'ঘরোয়া'-তে —

''এসরাজ বাজাতে শুরু করলুম ওস্তাদ কানাইলাল ঢেরীর কাছে; আমি, সুরেন ও অরুদা। ... আমার আর যাকে বলে এসরাজের টিপ, সে টিপ আর দোরস্ত হয় না। আঙুলে কড়া পড়ে গেল; তার টেনে ধরে ধরে। ... দেখতে দেখতে বেশ হাত খুলে গেল, বেশ সুর ধরতে পারি এখন, যা বলে ওস্তাদ তাই বাজাতে পারি, টিপও এখন ঠিক হয়।''[৬]

বাজনা বাজাতে পারলেও তিনি গান গাইতে পারতেন না, সেটা পারতেন তার রবি কাকা। ''গানটা আর আমার হল না। এই সেদিন কিছুকাল আগেই আমি রবিকাকাকে বললুম, দেখো, আমি তো গান গাইতে পারি না, তোমার সুর আমার গলায় আসে না, কিন্তু আমার সুরে যদি তোমর গান গাই, তোমার আপত্তি আছে? ... রবিকাকা বললেন, না, তা আর আপত্তি কী। তবে দেখো গানগুলো আমি লিখেছিলেম, সুরগুলোও দিয়েছি; সেগুলির উপর আমার মমতা আছে, তা নেহাত গাওই যদি তবে তার উপর একটু মায়া দয়া রেখে গেয়ো।''[৭]

অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিয়ে ছিলেন। শুধু তারা নন সেই সময় যেন স্বদেশী হুজগে সবাই মেতে উঠেছিল। তার বর্ণনা আছে 'ঘরোয়া'-তে — ''তখন এক সময়ে হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল কেউ আমরা তা বলতে পারি নে। ... আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন রবিকাকা। আমরা সব একদিন জুতোর দোকান খুলে বসলুম। ... মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হল দোকানের সামনে — 'স্বদেশী ভাণ্ডার'।''[৮]

রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই রাখীবন্ধন উৎসব শুরু হয়। আর তাতে সামিল হন অবনীন্দ্রনাথ।

হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলকে পরানো হয় রাখি। ''রবিকাকা একদিন বললেন, রাখী বন্ধন উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখি পরাতে হবে। ... ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব। ... রওনা হলুম সবাই গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে — মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম — যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল —

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল —
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
হে ভগবান।।

এই গানটি সেই সময়েই তৈরী হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখার জন্য আমাদের চারদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল - সঙ্গে নেওযা হয়েছিল এক গাদা রাখী, সবাই এ-ওর হাতে রাখী পরালুম।''[৯]

অবনীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকা শুরু করেন তখন দেশী ছবিতে বিদেশী ভাব প্রভাব ফেলত। অবনীন্দ্রনাথই প্রথম 'দেশীমতো' ছবি আঁকা শুরু করলেন —

''ছবি দেশীমতে ভাবতে হবে, দেশীমতে দেখতে হবে। রবিবর্মাও তো দেশীমতে ছবি এঁকে ছিলেন কিন্তু বিদেশী ভাব কাটাতে পারেন নি, সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। সেখানেই হল আমার পালা। বিলিতি পোরট্রেট আঁকতুম, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পটপটুয়া জোগাড় করলুম। যে দেশে যা কিছু নিজের নিজের শিল্প আছে, সব জোগাড় করলুম। যত রকম পট আছে সব স্টাডি করলুম, সেই খাতাটি এখনো আমার কাছে।''[১০]

অবনীন্দ্রনাথের দাদামশায় এর শখ ছিল বোটে চড়ে বেড়ানো। আবার কখনো তার সঙ্গী হতেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। সেই বোটে চড়তে চড়তেই লিখেছেন অনেক 'ফরমাসী' কবিতা —

''ফি রবিবারেই শুনেছি দাদামশায় বন্ধু-বান্ধব-ইয়ার-বক্সী নিয়ে বের হতেন — সঙ্গে থাকত খাতা-পেন্সিল, তাঁর ছবি আঁকার সখ ছিল, দু-একজোড়া তাসও থাকত বন্ধু-বান্ধবদের খেলবার জন্য। এই জগন্নাথ ঘাটে পিনিস থাকত, এখানে থেকেই তিনি বোটে উঠতেন। ... তাঁর সঙ্গে প্রায়ই থাকতেন কবি ঈশ্বর গুপ্ত। অনেক ফরমাসী কবিতাই ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন সে সময়। ঈশ্বর গুপ্তের ওই গ্রীষ্মের কবিতা দাদামশায়ের ফরমাশেই লেখা। বেজায় গরম, বেলগাছিয়া বাগানবাড়িতে তখন, ডাবের জল,

বরফ, এটা-ওটা খাওয়া হচ্ছে — দাদামশাই বললেন, লেখো তো ঈশ্বর, একটা গ্রীষ্মের কবিতা। তিনি লিখলেন —

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল,
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল্।''[১১]

'ঘরোয়া'-তে অবনীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন কিভাবে মারা গেলেন কর্তা দাদামশায় অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শুনিয়েছেন 'দিদিমা (নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী), কর্তাদিদিমার (সারদাদেবী) মৃত্যু কিভাবে হল।

অবনীন্দ্রনাথের সময়কার প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হত না, হত ইংরেজী ভাষাতে। তাই 'অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স-এ বাংলা ভাষাকে স্থান করে দেবার। কিভাবে তা সম্ভব হল সেই সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া' গ্রন্থে বলেছেন —

''আগে থেকেই ঠিক ছিল, রবিকাকা প্রস্তাব করলেন, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে। আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে, আমরা বললুম নিশ্চয়ই, প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় স্থান হওয়া চাই। রবিকাকাকে বললুম, ছেড়ো না, আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব এজন্য। সেই নিয়ে আমাদের বাধল চাঁইদের সঙ্গে। তাঁরা আর ঘাড় পাতেন না, ছোকরার দলের কথায় আমলই দেন না। তাঁরা বললেন, যেমন কংগ্রেস হয় তেমনি এখানেও হবে সব কিছু ইংরেজিতে। অনেক তক্কাতক্কির পর দুটো দল হয়ে গেল। একদল বলবে বাংলাতে, একদল বলবে ইংরেজিতে। সবাই মিলে গেলুম প্যাণ্ডেলে। বসেছি সব, কন্‌ফারেন্স আরম্ভ হবে। রবিকাকার গান ছিল, গান তো আর ইংরেজিতে হতে পারে না, বাংলা গানই হল। 'সোনার বাংলা' গানটা বোধহয় সেই সময়ে গাওয়া হয়েছিল — রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়ো।

এখন, প্রেসিডেন্ট উঠেছেন স্পীচ দিতে; ইংরেজিতে যেই না মুখ খোলা আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম বাংলা ভাষার দলে, সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম — বাংলা, বাংলা। মুখ আর খুলতেই দিই না কাউকে। ইংরেজিতে কথা আরম্ভ হলেই আমরা চেঁচাতে থাকি — বাংলা, বাংলা। মহা মুশকিল, কেউ আর কিছু বলতে পারে না। তবুও ওই চেঁচামেচির মধ্যেই দু-একজন দু-একটা কথা বলতে চেষ্টা করছিলেন। লালামোহন ঘোষ ছিলেন ঘোরতর ইংরেজি দুরস্ত, তাঁর মতো ইংরেজিতে কেউ বলতে পারে না, তিনি ছিলেন পার্লামেন্টারী বক্তা — তিনি শেষটায় উঠে বাংলায় করলেন বক্তৃতা। কী সুন্দর তিনি বলছিলেন। যেমন পারতেন তিনি ইংরেজিতে বলতে, তেমনি চমৎকার তিনি বাংলাতেও বক্তৃতা করলেন। আমাদের উল্লাস দেখে কে, আমাদের তো জয়-জয়কার। কনফারেন্সে

বাংলা ভাষা চলিত হল। সেই প্রথম আমরা পাবলিকলি বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।''[১২]

অবনীন্দ্রনাথ যখন প্রোভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স এ যোগ দিতে নাটোরে গিয়েছিলেন তখন একদিন সেখানে হঠাৎ ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। তারও স্মৃতিচারণা আছে 'ঘরোয়া'-তে — ''চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে এক চুমুক দিয়েছি কি, চারদিক থেকে দুপ্‌দুপ্‌ দুপ্‌দুপ্‌ শব্দ। কী হলো রে বাবা, কামান-টামান কে ছুঁড়ছে, বোমা নাকি। না বাজি পোড়াচ্ছে কেউ। হাতি খেপল না তো?

ওমা, আবার দুলছে যে দেখি সব — পেয়ালা হাতে যে যার ডাইনে বাঁয়ে দুলছে, প্যাণ্ডেল দুলছে। বহরমপুরের বৈকণ্ঠবাবু — তিনি ছিলেন খুব গল্পে, অতি চমৎকার মানুষ — তাড়াতাড়ি তিনি প্যাণ্ডেলের দড়ি দু-হাতে দুটো ধরে ফেললেন। দড়ি ধরে তিনিও দুলছেন। কী হল, চারদিকে হারিবোল হরিবোল শব্দ। ভূমিকম্প হচ্ছে। যে যেখানে ছিল ছুটে বাইরে এলে, হুলুস্থুলু ব্যাপার — শাঁখ, ঘন্টা আর হরিবোল, হরিবোল ধনিতে একটা কোলাহল বাঁধল, সেই শুনে বুক দমে গেল। কাঁপুনি আর থামে না, থেকে থেকে কাঁপছেই কেবল।''

নবগোপাল মিত্র 'হিন্দুমেলার' প্রবর্তন করেন। সেই সম্পর্কেও স্মৃতিচারণা আছে 'ঘরোয়া'তে। ''এইবারে হিন্দুমেলার গল্প বলি শোনো। একটা ন্যাশনাল স্পিরিটি কী করে তখন জেগেছিল জানি নে, কিন্তু চার দিকেই ন্যাশনাল ভাবের ঢেউ উঠেছিল। এটা হচ্ছে আমার জ্যাঠামশায়দের আমলের, বাবামশায় তখন ছোট। নবগোপাল মিত্তির আসতেন, সবাই বলতেন ন্যাশানাল নবগোপাল, তিনি সর্বপ্রথম ন্যাশানাল কথাটার প্রচলন করেন। তিনিই চাঁদা তুলে 'হিন্দুমেলা' শুরু করেন। তখনো ন্যাশানাল কথাটার চল হয় নি, হিন্দু মেলা হবে, মেজোজ্যাঠামশাই গান তৈরী করলেন —

মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ,
গাওভারতের যশোগান,

এই হল তখনকার জাতীয় সঙ্গীত। আর একটা গান গাওয়া হত, সে গানটি তৈরী করেছিলেন বড়োজ্যাঠামশায় —

মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত, তোমারি
রাত্রি দিবা করে লোচনবারি।

এই গানটি বোধহয় রবিকাকাই গেয়ে ছিলেন হিন্দু মেলাতে। বড়োজ্যাঠামশায়ের তখনকার দিনের লেখা চিঠিতে দেখেছি, এই নবগোপাল মিত্তিরের কথা। তিনিই উদ্যোগ করে হিন্দুমেলা করেন। গুপ্তবৃন্দাবনের বাগানে হিন্দুমেলা হত।''[১৩]

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে নাট্য চর্চার সূচনা কিভাবে হয় সে সম্পর্কেও অবনীন্দ্রনাথ 'ঘরোয়া'-তে স্মৃতিচারণা করেছেন — ''এখন আমাদের বাড়ির নাটকের সূচনা এই, বাবামশায় তখন ছোটো। বাবামশায়, জ্যোতিকাকামশায় ও কৃষ্ণবিহারী সেন এক স্কুলে পড়েন। আর্ট স্কুলেরও প্রথম ছাত্র ওঁরা। আমাদের বাড়ির একতলার একটি কোণের ঘরে ওঁরা মতলব করেছেন মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয় করবেন। জ্যাঠামশায়ের কানে গেল কথাটা। উনি ছোটো ভাইকে ডেকে পাঠালেন। তখনকার দিনে ছোটো ভাই বড়ো ভাই খুব বেশি কাছাকাছি আসতেন না। তা ছোটোভাই কাছে আসতে বললেন, থিয়েটার করবে সে তো ভালো, তবে কৃষ্ণকুমারী নয় — ও তো হয়ে গেছে পাথুরেঘাটায়। নতুন একটা কিছু করতে হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দাও, যে বহুবিবাহ সম্বন্ধে একখানা নাটক লিখে দিতে পারবে তাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন লিলেন বহুবিবাহ নাটক। একখানা দামী শাল ও পাঁচশো টাকা পুরস্কার পেলেন। নাটকের নাম হল 'নবনাটক'।''[১৪]

রবীন্দ্রনাথের সময় থেকে ঠাকুর বাড়ির লোকেদের দ্বারা লিখিত নাটকেরই অভিনয় হত। আর অভিনয়ে ঠাকুর বাড়ির লোকেরাই অভিনয় করত। তেমনি একটি বহু অভিনীত নাটাক 'বাল্মীকি প্রতিভা'। স্মৃতিচারণায় বলেছেন —

''তারপর ওঁরা বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয় করলেন, তখন বাড়ির মেয়েদের ডাক পড়ল। ... প্রতিভা দিদি সরস্বতী সাজলেন, রবিকাকা সাজলেন বাল্মীকি ঋষি, সারদা পিসেমশায়, কেদার দাদা, অক্ষয়বাবু এঁরা সব সেজেছিলেন বড়ো বড়ো ডাকাত। থেকে থেকে বাল্মীকি প্রতিভা অভিনয় হয়।''১৫

ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা একটা ড্রামাটিক ক্লাব তৈরী করেছিলেন। 'অলীকবাবু' এই ড্রামাটিক ক্লাবে অভিনীত হয়। এতে অভিনয় করেন অবনীন্দ্রনাথ। 'ঘরোয়া'-তে রয়েছে তার কথা —

''একবার ড্রামাটিক ক্লাবে 'অলীকবাবু' অভিনীত হয়। অলীকবাবু জ্যোতিকাকামশায়ের লেখা, ফরাসী গল্প, মোলেয়ারের একটা নাটক থেকে নেওয়া। সেই ফরাসী গল্প উনি বাংলায় রূপ দিলেন। রবিকাকা নিলেন অলীকবাবুর পার্ট, আমি ব্রজদুর্লভ, অরুদা মাড়োয়ারি দালাল। ... আমার ব্রজদুর্লভের পার্ট ছিল খুব একটা বখাটে বুড়োর। হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করতে আসছে একে একে এও। আমি মানে ব্রজদুর্লভ, তাদেরই একজন। গায়ে দিয়েছিলুম নীল গোছের জামা — আমার ফুলশয্যার সিল্কের জামা ছিল সেটা — তখনকার চলতি ছিল ওই রকম জামার। সোনার গার্ড-চেন বুকে, কুঁচিয়ে ধুতির কোঁচাটি কালাচাঁদবাবুর মতো বুক-পকেটে গোঁজা যেন একটি ফুল, হাতে শিঙের ছবি ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেজে ঢুকলুম। একটু একটু মাৎলামি ভাব। ... রাধানাথ দত্ত বলে একটি লোক প্রায় এইখানে আসতেন,

মদটদ খাওয়া অভ্যেস ছিল তাঁর। তাঁর মুখে একটা গান শুনতুম, জড়িয়ে জড়িয়ে গাইতনে আর ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে রাধাবাবুর হুবহু নকল করে স্টেজে ঢুকে গান ধরলুম —

আয়কে তোরা যাবি লো সই
আনতে বারি সরোবরে।

এই দুই লাইন গাইতেই চারিদিক থেকে হাততালির উপর হাততালি। রাধাবাবুর মুখ গম্ভীর। সবাই খুব বাহবা দিলে। রবিকাকা মহা খুশি; বললেন, বেড়ে করেছ অবন, ও গানটা যা হয়েছে চমৎকার। আর সত্যিই আমি খুব ভলো অভিনয় করেছিলুম।''[১৬] এভাবেই 'ঘরোয়া'-তে ছড়িয়ে রয়েছে জোড়সাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ও তৎকালীন সময়ের নানা কথা।

জোড়াসাঁকোর ধারে (১৯৪৪) ঃ

'' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' প্রকাশিত হয় ১৩৫১ সালের কার্ত্তিক মাসে। প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী। এই গ্রন্থও 'ঘরোয়া'-র মতোই শ্রুতিধরী শ্রীমতী রাণীচন্দ্র কর্তৃক লিপিধৃত। সূচনায় অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যত সুখের স্মৃতি, তত দুঃখের স্মৃতি — আমার মনের এই দুই তারে ঘা দিয়ে দিয়ে এই সব কথা আমার শ্রুতিধরী শ্রীমতী রাণীচন্দ্র এই লেখায় ধরে নিয়েছেন।' .... ''[১৭]

'শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী রাণীচন্দ্র লিখেছেন ঃ ''কুটুম-কাটাম আর ছবির ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে অবনীন্দ্রনাথের কাছ হতে গল্প সংগ্রহ করছি। তবে এবারের গল্প আমাদের আগের মতো জমছে না মোটেই, কোথায় যেন সুর কেটে গেছে। সেই শখ করে গল্প ঢেলে দেওয়া — সে আর হয় না। তাই তঁরা অজান্তে যেটুকু পেরেছি, গল্প ধরে রাখছি।

একদিন ভয়ে ভয়ে এনে কিছুটা গল্প পড়ে শোনালাম তাঁকে। তিনি চুপ করে রইলেন। পরের দিন খুব ভোরে নিজেই চলে এলেন কোণার্কে। তাঁর চলায় বসায় বিরক্তিভাব। বললেন, দেখো, যা লিখেছ ছিঁড়ে কুটে ফেলো। এখন আমার গল্প পড়বে কে? যিনি পড়ে খুশি হতেন তিনি চলে গেছেন। বলে উঠে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে কী মনে হল, বোধ হয় আমার প্রতি অনুকম্পা হল, বললেন একদিন, আচ্ছা থাক্ ওগুলো; চলতে থাকুক। দেখি কতটা যায়, সেই বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে পরে। এরপর হতে তাঁর মনের গতি বুঝে তাকে গল্প পড়ে শোনাই। এই সব গল্পই পরে 'জোড়াসাঁকোর ধারে' নাম দিয়ে বই বের হয়। এই বইয়ে তাঁর গল্প দিয়েই তাঁর জীবনে নানা ঘটনা, নানা দুঃখ-সুখ, অনেকটা ধরে দেওয়া হয়েছে। এই বই তাঁরই জীবন কাহিনী বলতে পারা যায়।''[১৮]

অবনীন্দ্রনাথের 'জোড়াসাঁকোর ধারে' স্মৃতিচারণা মূলক রচনা হলেও এর মধ্যে রূপকথার

আমেজ খুঁজে পেয়েছেন প্রমথনাথ বিশী। তিনি তাঁর 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

''অবনীন্দ্রনাথের সব কথাই রূপকথা। তাঁহার প্রথমতম গ্রন্থ হইতে শেষতম (আশা করি ইহাই শেষ নহে) 'জোড়াসাঁকোর ধারে' অবধি সবই রূপকথা। তাঁহার সমস্ত রচনা যেন একখানা সুদীর্ঘ মসলিনের থান; ক্রমে ক্রমে অকুণ্ডলীকৃত হইয়া খুলিয়া চলিয়াছে। প্রথম দিকে তার সুতাগুলি মোটা, বুনানি তেমন জমাট নয়; কিন্তু কালক্রমে তাহা সূক্ষ্মতর ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিয়াছে। আবার এই সাদা জমিনের উপর নানা রঙের ছাপ আছে। কোনোখানে 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯৬), 'শকুন্তলা' (১৮৯৫), এর ছাপ; কোনখানে বা নালক, রাজকাহিনীর ছাপ; শেষের দিকে সূতা যেখানে অতিশয় সূক্ষ্ম সেখানে ভূতপত্রী, খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১), বুড়ো আংলার ছাপ; শেষ দুইটি ছাপ দেখিতেছি ঘরোয়া এবং জোড়াসাঁকোর ধারের। এই মসলিনের থানের সবটাই একই হাতের বুনন বলিয়া ইহার যে কোনো অংশ সমগ্রের স্বাদ দিতে সক্ষম। অবনীন্দ্রনাথের রচনার একই রস বলিয়া কোনো এখখানা বই পড়িলে একরকম সব বই পড়ার কাজ হইয়া যায়। ... কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, ঘারোয়া ও জোড়াসাঁকোর ধারের সমসাময়িক ইতিহাসকে তিনি রূপ কথায় পরিণত করিয়াছেন। এ কেমন করিয়া সম্ভব হইল? আগে বলিয়াছি রূপকথায় পরিণত হইতে বাস্তবের কিছু সময় লাগে, কিন্তু ঠিক কতটা সময় লাগে তাহা বলি নাই, কারণ তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। জোড়াসাঁকোর ইতিহাস সমসাময়িক হলেও তাহার এত শীঘ্র রূপকথায় রূপান্তরিত হইবার অনুকূলে কিছু কারণ আছে।

প্রথমত, জোড়াসাঁকোর ইতিহাসের প্রথম অঙ্ক বাংলাদেশের একটি বিগত যুগের কথা। সে যুগ অল্পদিন গত হইলেও ইতিমধ্যে যেন বহুযুগ আগে গিয়া পড়িয়াছে। সেদিনের পল্লী কলিকাতার সঙ্গে আজকার যান্ত্রিক কলিকাতার যে প্রভেদ তাহা কেবল সময়ের নহে, দুই জীবনের প্রভেদ। পল্লীর জীবন ভঙ্গি হইতে আজ আমরা বহুদূরে চলিয়া আসিয়াছি; দুই-তিন পুরুষকালের মধ্যে বহুকালের তফাত ঘটিয়া গিয়াছে; প্রায় 'এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর' গোছের। দুইয়ের রসই আলাদা হইয়া গিয়াছে। লেখক এই রসভেদের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, সময়ের দূরত্বের উপরে ইতিহাসের ঘটনা ঘনীভূত হইয়া চাপিয়া বসিয়া তাহাকে নূতন অর্থ, নূতনের দূরত্ব দিয়েছে। ... সামান্য কয়েক বছরের উপর বহু শতাব্দীর নিহিতার্থ ঘনীভূত হইয়া একটা পারিবারিক কাহিনীকে রূপকথার অলৌকিকত্ব দান করিয়াছে। অঙ্গার প্রকৃতির রিয়ালিজম; প্রকৃতির রূপকথা হীরক। তৃতীয়ত, লেখকের বিশেষ সাহিত্যিক গুণ।''[১৯]

রবীন্দ্রনাথের মতো ভাইপো অবনীন্দ্রনাথেরও স্কুলের বদ্ধ পরিবেশ ভালো লাগতো না। অনিচ্ছা

সত্ত্বেও তাকে স্কুলে যেতে হত বাড়ির লোকের চাপে। তার বর্ণনা আছে 'জোড়াসাঁকোর ধারে' স্মৃতি গ্রন্থে —

''এখন দেখি ছোটো ছেলেরা হো-হো করে স্কুলে যায় আসে খাতা বই দু-হাতে বুকে জড়িয়ে নিয়ে। কত ফুর্তি তাদের। এমন স্কুল আমাদের ছেলেবেলায় পেলে আমিও বুঝি-বা একটু আধটু লেখাপড়া শিখলেও শিখতে পারতুম। বাড়ির কাছেই নর্মাল স্কুল। কিন্তু হলে হবে কী? নিজের ইচ্ছায় কোনোদিন যাইনি স্কুলে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই; আজ পেটে ব্যথা, কাল মাথা ধরার ছুতো — রেহাই নেই কিছুতেই। স্কুলে যাবার জন্য গাড়ি আসে গেটে। চিৎকার কান্নাকাটি - যাব না, কিছুতেই যাব না। চাকররা জোর করে গাড়িতে তুলবেই তলবে। মনে হয় গাড়ির চাকা দুটো বুকের উপর দিয়ে চলে যাক সেও ভালো, তবু স্কুলে যাব না। মহা ধস্তাধস্তি, অতটুকু ছেলে পারব কেন তাদের সঙ্গে? আমার কান্নায় ছোটোপিসিমার এক একদিন দয়া হয়, বলেন — 'ও গুনু, নাই-বা গেল অবা আজ স্কুলে।' রামলালকে বলেন, 'রামলাল, আজ আর ও স্কুলে যাবে না, ছেড়ে দে ওকে।' কোনো কোনো দিন তার কথায় ছাড় পাই। কিন্তু বেশিরভাগ দিনই চাকররা আমায় দুহাত ধরে ঠেলে গাড়ির ভিতরে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। গাড়ি চলতে শুরু করে, কী আর করি, জোরে না পেরে বন্দী অবস্থায় দু-চোখের জল মুঝে গুম হয়ে বসে থাকি। স্কুল ভালো লাগে না মোটেই।''[২০]

নর্মাল স্কুলের ইংরেজির মাস্টারমশায় তাদেরকে পাডিং পড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি বলেন উচ্চারণ হবে পুডিং। আর তার ফলে তাকে প্রচণ্ড প্রহার খেতে হয় এবং তার বাবা স্কুল ছাড়িয়ে দেন —

''... একদিন হয়েছে কি — ক্লাসে ইংরেজির মাস্টার আমাদের পড়ালেন P-u-d-d-i-n-g – পাডিং। আমার মাথায় কী বুদ্ধি খেলে গেল, বলে উঠলুম, 'মাস্টারমশায়, এর উচ্চারণ তো পাডিং হবে না, পুডিং, আমি যে বাড়িতে এ জিনিস রোজ খাই।' মাস্টার ধমকে উঠলেন, 'বল পাডিং।' আমি বলি, 'না, পুডিং।' ... মাস্টার নিজের বৈকালিক সেরে এলেন। ঘরে ঢুকে বললেন, 'এবারে বল পাডিং।' উত্তর দিলেম, 'পুডিং।' যেমন, শোনা, টানাপাখার দড়ি দিয়ে হাত দুটো বেঁধে 'তবে রে ব্যাদড়া ছেলে, বলবি নে? বলতেই হবে তোকে পাডিং, দেখি কেমন না বলিস।' বলে সপাসপ জোড়া বেত লাগালেন পিঠে। বেতের ঘায়ে পিঠ হাত লালা হয়ে গেল — তখনো বলছি পুডিং, রামলাল ব্যস্ত হয়ে বারে বারে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখে, এ কী কাণ্ড হচ্ছে। যে হোক, বাড়ি এলাম। ছোটোপিসিমা বললেন, 'কী ব্যাপার?' রামলাল বললে, 'আমার বাবু আজ বড্ড মার খেয়েছেন।' আমিও জামা খুলে পিঠ দেখালুম, হাত দেখালুম। দড়ির দাগ বসে গিয়েছিল হাতে। বাবামশায় তৎক্ষণাৎ নর্মাল থেকে নাম কাটাবার হুকুম দিলেন; বললেন, 'কাল থেকে ছেলেরা বাড়িতে পড়বে।' চুকে গেল ইস্কুল যাবার ভয়;

জোড়া বেত খেয়ে ছাড়া পেলুম। এক 'পাডিং' এই ইংরেজি বিদ্যে শেষ। পরদিন থেকে বাড়িতে বাবামশায়ের মাস্টার যদু ঘোষাল আমায় পড়াবার ভার নিলেন।''[২১]

স্কুলে না যাওয়ার জন্য তাঁকে বাড়িতে একা একা সময় কাটাতে হত। আর এই থাকতে গিয়ে তার দেখার চোখ খুলে গিয়েছিল। তার কথাও তিনি জানিয়েছেন এই রচনাতে —

''... তবে একলা থাকার গুণ আছে একটা। দেখতে শুনতে শেখা যায়। ওই অমনি করে একলা থাকতে থাকতেই চোখ আমার দেখতে শিখল, কান শব্দ ধরতে লাগল। তখন থেকেই কত কী বস্তু, কত কী শব্দ যেন মন — হরিণের কাছে এসে পৌঁছতে লেগেছে। মানুষ পশুপাখি সঙ্গী পেলেম না কাউকেই। ওই অত বড়ো বাড়িটাই তখন আমার সঙ্গী হয়ে উঠল। নতুন রূপ নিয়ে আমার কাছে দেখা দিতে লাগল।''[২২]

জমিদারবাড়ির সন্তান হলেও তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে সাদাসিধে ভাবে। সেই প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণায় বলেছেন —''ওকি ও, স্যাঙাত, সোয়েটার এঁটে এসেছ এরই মধ্যে? আমাদের ছেলেবেলায় কার্তিক মাসের আগে গরম কাপড়ের সিন্দুকই খুলত না, ম্যালেরিয়া হলেও। সাদাসিধে ভাবেই মানুষ হয়েছি আমরা। তখন এত উলের ফ্রক, শার্টমাট, সোয়েটার, গেঞ্জি, মোজা পরিয়ে তুলোর হাঁসের মতো সাজিয়ে রাখবার চল ছিল না। খুব শীত পড়লে একটা জামার উপরে আর একটা সাদা জামা, তার উপরে বড়োজোর একটা বনাতের ফতুয়া, এই পর্যন্ত। চীনেবাড়ির জুতো কখনো কচিৎ তৈরী হয়ে আসত — তা সে কোন্ আলমারির চালে পড়ে থাকত খবরই হত না, খেলাতেই মত্ত।''[২৩]

অবনীন্দ্রনাথের ছিল একটা কল্পনাপ্রবণ মন। তিনি কল্পনার জগতেই ডুবে থাকতে ভালোবাসতেন। সে সম্পর্কে স্মৃতিচারণায় বলেছেন — ''এমনি করে চলত আমার চোখের দেখা সারাদিন ধরে। রাত্রে যখন বিছানায় যেতুম তখনো চলতো আমার কল্পনা। নানারকম কল্পনায় ডুবে থাকত মন; স্পষ্ট যেন দেখতে পেতুম সব চোখের সামনে। খড়খড়ির সামনে ছিল কাঁঠাল গাছ। জ্যোৎস্না রাত্তির, চাঁদের আলোয় কাঁঠাল তলায় ছায়া পড়েছে ঘন অন্ধকার। দিনের বেলায় চাটুজ্জেমশায় বলেছিলেন, আজ রাত্রিরে কাঁঠালতলায় যেন সত্যি কাঠবেড়ালির বিয়ে হচ্ছে, খুদে খুদে আলোর মশাল জ্বালিয়ে এল তাদের বরযাত্রী বরকে নিয়ে, মহা হৈ-চৈ, বাদ্যভাণ্ড, দৌড়া-দৌড়ি, হুলুস্থুলু ব্যাপার। সব দেখছি কল্পনায়। কাঁঠালতলায় যে জোনাকি পোকা জ্বলছে তা তখন জ্ঞান নেই।''[২৪]

অবনীন্দ্রনাথের দাদারা বিলেত গেলেও তাঁর বাবা তাঁকে বিলেতে পাঠাতে চান নি। বাবার ইচ্ছে ছিল তাঁকে ভারতের চার প্রান্তে ঘুরিয়ে ভারতকে চেনানো। সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন —

''সেই সময়ে পলতার বাগানে একবার ঠিক হয়, দাদা বিলেতে যাবেন। সাদা পোশাক সব তৈরী করবার ফর্মাশ গেল কলকাতায় সাহেব দর্জির দোকানে। বাবামশায় বললেন, 'মেজদা আছেন বিলেতে, গগন বিলেত যাক। সতীশ আছে জার্মানীতে, সমর সেখানে যাবে।' আমাকে দেখিয়ে বড়পিসিমাকে বললেন, 'ও থাকুক এখানেই। আমার সঙ্গে ঘুরবে, ইণ্ডিয়া দেখবে, জানবে।' তখন থেকেই সকলে আমার বিদ্যে-বুদ্ধির আশা ছেড়ে দিয়েছিল। বুঝেছিলেন, ও-সব আমার হবে না। বিদেশ তো যাওয়াই হল না, এ দেশেও আর বাবামশায়ের সঙ্গে ঘোরা হয় নি। তবে বাবামশায় যে বলেছিলেন, 'ইণ্ডিয়া দেখবে জানবে,' তা হয়েছে। ভারতবর্ষের যা দেখেছি চিনেছি তিনি থাকলে খুশি হতেন দেখে।''২৫

অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে সর্বদাই ছিল একটা ছেলেমানুষী ভাব। তিনি চির শিশু হয়ে থাকতেই ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর বাবার মৃত্যুতে তাঁর সেই ছেলেবেলা যেন কোথায় হারিয়ে যায়। তিনি বলেছেন —

''এমন সময়ে খবর হল বাবামশয়ের অসুখ। এত হৈ-চৈ হতে হতে কেমন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছায়া পড়ল সবার মুখে-চোখে, চলায় বলায়। পিশেমশাইরা ছুটলেন ওষুধ আনতে, ডাক্তার ডাকতে; নীলমাধববাবু হাঁকছেন, 'বরফ আন, বরফ আন্।' দাসদাসীরা গুজ্ গুজ্ ফিস্ফাস্ করছে এখানে ওখানে। জ্যৈষ্ঠ মাস; ঝড়ের মেঘ উঠল কালো হয়ে, শোঁ-শোঁ বাতাস বইল। ভোরে বেলা দাশীরা আমাদের টেনে তুলে দিলেন, 'যা, শেষ দেখা দেখে আয়।' নিয়ে গেল আমাদের বাবামশায়ের ঘরে। বিছানায় তিনি ছট্ফট্ করছেন। পাশ থেকে কে একজন বললেন, 'ছেলেদের দেখতে চেয়েছিলে। ছেলেরা এসেছে দেখো।' শুনে বাবামশায় ঘাড় একটু তুলে একবার তাকালেন আমাদের দিকে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মাথা কাত হয়ে পড়ল বালিশে। বড়োপিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একি, একি হল। কালজ্যৈষ্ঠ এল রে, কাল জ্যৈষ্ঠ।' সেদিন থেকে ছেলেবেলাটা যেন ফুরিয়ে গেল।''[২৬]

অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার প্রতিভা ছিল স্বভাবজাত। তার জন্য তাঁকে আলাদা করে প্রয়াস করতে হত না। তিনি কিভাবে ছবি আঁকেন সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন —

''কালি কলম মন

লেখে তিনজন।

ছবিটি আঁকি, তুলিটি জলে ডোবাই, তবে লিখি ছবিটি। সেই ছবিই হয় মাস্টারপিস। অবিশ্যি, সব ছবি আঁকতে যে এভাবে চলি তা নয়। জলে ডুবিয়ে রঙে ডুবিয়ে অনেক ছবির কাজ সেরে দিই, মন পড়ে থাকল বাদ। এমনি ছবি একটা এঁকে যদি ছিঁড়ে ফেলতে যাই, তোমরা খপ করে হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে পালাও। ঠকে যাও জেনো।''২৭

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'পাগলা' বলতেন। তাঁর এই পাগলামি প্রকাশ পেত বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে। তিনি বলেছেন — ''রবিকা বলতেন, 'অবন একটা পাগলা।' সে কথা সত্যি। আমিও এক-এক সময়ে ভাবি, কী জানি কোন দিন হয়তো সত্যিই খেপে যাবো। এতদিন হয়তো পাগলই হয়ে যেতুম, কেবল এই পুতুল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই নিয়েই কোনো রকমে ভুলে থাকি। নয় তো কী দশাই হত আমার এতদিনে।''২৮

আর্ট স্কুল, বিদেশী গুরু হ্যাভেল তাঁকে দেশীয় আর্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে বলেছেন — ''আর্ট স্কুলের চৌকিতে বসে থাকতুম; কত দেশ বিদেশ থেকে নানারকম ব্যাপারী আসত নানা রকম জিনিস নিয়ে। গবর্মেন্টের টাকায় আর্ট গ্যালারির জন্য জিনিস সংগ্রহ করেছি, সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্টের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটে যাচ্ছে। এই করে আমি চিনেছিলাম দেশের আর্ট; তার উপর ছিলেন আমার হ্যাভেল-গুরু। এ দেশের আর্ট বুঝতে এমন দুটি ছিল না, রোজ দু-ঘন্টা নিরিবিলি তাঁর পাশে বসিয়ে দেশের ছবি, মূর্তির সৌন্দর্য্য, মূল্য, তার ইতিহাস বুঝিয়ে দিতেন। হুকুম ছিল আপিসের চাপরাসিদের উপর ওই দু-ঘন্টা কেউ যেন না এসে বিরক্ত করে।

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ।
তব্ কয়লা কী ময়লা ছোটে
যব্ আল্ করে পরবেশ।

ভাবি সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল সাহেব অমন করে যদি না বোঝাতেন ভারত শিল্পের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম কয়লাই হয়তো থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটত না দেশের শিল্প সৌন্দের্যের দিকে।''[২৯]

অবনীন্দ্রনাথ ও সভ্যরা একটি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির নাম বিভিন্নজন বিভিন্ন প্রস্তাব করলেও, শেষ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত নামই গৃহীত হয়। তিনি বলেছেন —

''... এখন এই সোসাইটির নাম কী দেওয়া যায়? কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন, 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি'। আমি বললুম, 'না, নাম হোক ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি।' শুধু বাঙালি নয়, দুই সম্প্রদায় মিলল এতে। দাদাও ছিলেন। অনেক স্থায়ী সভ্য হলেন। পার্ক স্ট্রীটে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল, আর্টিস্টরা কাজ করবে সেখানে, কেউ যদি ইচ্ছে করে থাকতেও পারবে, এমন ব্যবস্থা রইল। আর্ট স্কুলের মস্ত হলে দু-তিনটে ছবির এক্‌জিবিশন হল।''[৩০]

ছাত্রদের তিনি হাতে ধারে ছবি আঁকা শেখাতেন না। ভুলগুলো একটু-আধটু সংশোধন করে দিতেন। তিনি ছাত্রদের নিজস্বতার উপর জোর দিতেন। সে সম্পর্কে বলেছেন —

''ছবি আঁকা শিখতে কদিন লাগে? বেশি দিন না, ছ-মাস, আমি শিখিয়েছিও তাই। ছ'মাসে আমি আর্টিস্ট তৈরি করে দিয়েছি। এর বেশি সময় লাগা উচিত নয়। এরই মধ্যে যাদের হবার হয়ে যায় — আর যাদের হবে না তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত। ... ছবি আঁকবে তুমি নিজে, মাস্টারমশায় তার ভুল ঠিক করে দেবেন কী? তুমি যেরকম গাছের ডাল দেখেছ তাই এঁকেছ। মাস্টারমশায়ের মতন ডাল আঁকতে যাবে কেন? তরকারিতে নুন বেশি হয়, ফেলে দিয়ে আবার রান্না করো; পায়েস মিষ্টি কম হয়, মিষ্টি আরো দাও। ছবিতেও ভুল হয় — ফেলে দিয়ে আবার নতুন ছবি আঁকো। আমি হলে তাই করতুম। ছবিতে আবার ভুল শুধরে দিয়ে জোড়াতাড়া দেওয়া ও কিরকম শেখানো। দরকার হয়; আর একটু নুন দিতে পারো। দারকার হয়, একটু চিনি তাও দিতে পারো। কিন্তু গাছের ডালটা এমনি হবে, পা'টা এমনি করে আঁকতে হবে, এরকম করে শেখাবার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। আমি নন্দলালদের অমনি করেই শিখিয়েছি। তবে ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয়, এঁকে যাও, কিছু এদিক ওদিক হয় তো আমি আছি।''[৩১]

আবার রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর লেখালেখি শুরু। লিখে ফেললেন একের পর এক বই। সেসম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন —

''একদিন আমায় উনি বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম, বাপ রে, লেখা — সে আমার দ্বার কস্মিনকালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনের জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' এই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যা। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখার ক্ষমতা আছে। এতে যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড়ো ফূর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেত লাগলুম — ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন, 'ভয় কী, আমিই তো আছি' সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।''[৩২]

আরব্য উপন্যাসের ছবির সেট আঁকার পর দশ-এগারো বছর তিনি আর ছবি আঁকেন নি। যা অনেকের মতো রবীন্দ্রনাথকেও অবাক করেছিল। সে সম্পর্কে তিনি স্মৃতিচারণায় বলেছেন — ''রবিকা বললেন, 'অবন, তোমার হল কী? ছবি আঁকা ছাড়লে কেন?' বললুম, 'কী জান রবিকা এখন যা ইচ্ছে করি তাই এঁকে ফেলতে পারি, সেই জন্যেই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার জন্যে মন ব্যস্ত।' ''[৩৩]

এভাবেই 'জোড়াসাঁকোর ধারে' স্মৃতিগ্রন্থে ছড়িয়ে আছে টুকরো টুকরো অসংখ্য ছবি। যা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সময়কে আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান করে তোলে।

আপন-কথা

'' 'আপন-কথা' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের আষাঢ় মাসে। প্রকাশ করেন সিগনেট প্রেস। ... গ্রন্থভুক্ত হবার আগে 'আপন-কথা'-র অন্তর্গত অধিকাংশ রচনা বিভিন্ন সামকি পত্রে মুদ্রিত হয়। কোন রচনা কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল ঃ পদ্মদাসী - বঙ্গবানী - ফাল্গুন - ১৩৩৩, চিত্রা - পৌষ ১৩৩৫; সাইক্লোন - বঙ্গবানী - বৈশাখ ১৩৩৪, চিত্রা - মাঘ ১৩৩৫; উত্তরের ঘর - বঙ্গবানী - জৌষ্ঠ ১৩৩৪, চিত্রা - ফাল্গুন ১৩৪৫; এ আসল সে আসল - বঙ্গবানী - আষাঢ় ১৩৩৪, চিত্রা - চৈত্র ১৩৩৫; এ বাড়ি ও বাড়ি - বঙ্গবানী - শ্রাবণ ১৩৩৪, চিত্রা - বৈশাখ ১৩৩৬; বারবাড়িতে - বঙ্গবানী - ভাদ্র ১৩৩৪, চিত্রা - জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬। পত্রিকায় প্রকাশকালে রচনাগুলির শিরোনাম সব সময়ে গ্রন্থের অনুরূপ নয়। শিরোনাম ছিল এই রকম ঃ

গ্রন্থ	বঙ্গবানী	চিত্রা
পদ্মদাসী	আপন-কথা	আপন-কথা (পদ্মদাসী)
সাইক্লোন	আপন-কথা (সাইক্লোন)	আপন-কথা, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (সাইক্লোন)
উত্তরের ঘর	আপন-কথা (ঘর ঘর)	আপন-কথা, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী
এ আমল সে আমল	আপন-কথা (এ আমোল সে আমোল)	আপন-কথা, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (এ আমোল সে আমোল)
বারবাড়িতে	আপন-কথা (বারবাড়িতে)	আপন-কথা, শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আত্ম জীবনী (বারবাড়িতে)'' [৩৪]

ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'লিপির শিল্পি অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে 'আপন কথা' রচনা সম্পর্কে বলেছেন — ''... বইটি অবনীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করে লিখেছেন — 'আমার ভাব ছোটোদের সঙ্গে - তাদেরই দিলেম এই খাতা।' আপাত দৃষ্টিতে এ খাতা 'তাদেরই' দেবার মত; বিষয়বস্তু শিল্পীর বাল্যস্মৃতি। তাহলেও, সে গল্পেরও শ্রোতা আসলে বক্তা নিজেই, একটি প্রতিভাধর খেয়ালী স্বভাব-শিশু। ফলে

'আপন-কথা'-র প্রকাশ রীতিতে পরিশীলিত মনের সচেতন ভাষণ কিছু জটিলতা, কিছু অনচ্ছতা হয়তো গড়ে তোলে। তার সবটুকু কেটে গেছে 'ঘরোয়া' (১৩৫১), এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে'(১৩৫১) তে। আসলে 'আপন-কথা' আর পরোক্ত দুটি বইয়ের বিন্যাস ও বাকরীতির যে তফাৎ, তার অনেকটাই লিখে-বলা আর মুখে-বলার উদ্দেশ্য এবং প্রকরণগত পার্থক্যের দরুন।''[৩৫]

'আপন-কথা' রচনায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলাকার গল্প শুনিয়েছেন। আর তাঁর এই গল্প বলা শুধু যে শিশুদেরই জন্য তার কথা তিনি বলেছেন এভাবে — ''যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে 'গল্প বলো', সেই শিশু জগতের সত্যিকার রাজা-রানী, বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা পাতা ক'খানা, শিশু সাহিত্য সম্রাট যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের জন্য রইল বাঁ-হাতে সেলাম; আর ডান হাতের কুর্নিশ রইল তাদের জন্য যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো, কিন্তু ছেঁড়া মাদুর নয়তো মাটিতে বসে; আর গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বকশিশ দিয়ে চলে একটু হাসি কিম্বা একটু কান্না; মানপত্রও নয়, সোনার পদকও নয়, হয় একটু দীর্ঘশ্বাস, নয় একটুখানি ঘুমেঢোলা চোখের চাহনি; ওই তারা যারা আমার মনের সিংহাসন আলো করে এসে বসে, তাদেরই আদাব দিয়ে বলি, গরীব পরবর সেলামৎ অব্ আগাজ্ কিস্‌কে করতা হুঁ, জেরাকান দিয়ে কর শুন্যে।''[৩৬]

এই রচনাতে আছে ৭টি গল্প। পদ্মদাসী, সাইক্লোন, উত্তরের ঘর, এ আমল সে আমল, বারবাড়িতে, অসমাপিকা, বসতবাড়ি — এই ৭টি গল্প। এই গল্পগুলির মধ্য থেকেই আমরা অবনীন্দ্রনাথ ও তৎকালীন সময়ের অনেক ইতিহাসও জেনে যাই।

পদ্মদাসী ঃ

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছেলেরা চাকরদের অধীনে মানুষ হত। রবীন্দ্রনাথের যেমন ছিল শ্যাম, তেমনি ভাবে অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কেটেছিল পদ্মদাসীর কোলে। এই দাসীরই বর্ণনা আছে এই গল্পে। তার খাওয়া, স্নান, ঘুমপাড়ানো সবই হত দাসীর তত্ত্বাবধানে। আর এই দাসীর কালো অদ্ভুত রূপ তার মধ্যে এক অন্য অনুভূতি সৃষ্টি করত। অবনীন্দ্রনাথ মাঝে মধ্যে ডুব দিতেন কল্পনার জগতে।

সাইক্লোন ঃ

অবনীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় থাকতেন তেতলার ঘরে। একদিন রাত্রে হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। বাড়ির সকলে তাতে ভীত হয়ে পড়ে। আর অবনীন্দ্রনাথ সেই ঝড়ের রাতের অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে নেয়। হঠাৎ মিলিত হয়ে যান পিসি-পিসেমশাইদের সঙ্গ। সেই প্রথম তিনি প্রচণ্ড ঝড়কে যে

'সাইক্লোন' বলে তাও শিখে নেন। এতে আছে এমনই এক আশ্বিনের ঝড় ও অবনীন্দ্রনাথের টুকরো টুকরো বিভিন্ন কল্পনার কথা। যা তার মনকে আবেশে ভরিয়ে রাখত।

উত্তরের ঘর ঃ

অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা কাটত এই উত্তর এর তিনতলার ঘরে। এই ঘরের নির্জনতা তার মনে আনত বিভিন্ন কল্পনার জগৎ। সেই ঘর থেকে সে রাস্তার বিভিন্ন দৃশ্য উপভোগ করত। কখনো দেখতেন পালকি গাড়ি থেকে নামছে গম্ভীর এক বাবু, ছাতা নিজেই ফটকের দিকে এগিয়ে চলে, যাত্রা-থিয়েটার দেখার প্রসঙ্গ এমন সব কথা। আবার সেই ঘরের এককোণে বসে দাসীর বলা রূপকথা তাকে রূপকথা ও ছড়ার জগতে নিয়ে যেত। এভাবেই উত্তরের ঘর তার মনে একটা জায়গা করে নিয়েছিল।

এ-আমল সে-আমল ঃ

এখানে অবনীন্দ্রনাথ এ-আমল অর্থাৎ তার সময় এবং সে-আমল অর্থাৎ তার ছোটোকর্তার সময়ের বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ছোটোকর্তার বিভিন্ন সখ, বকুলতলার বাড়ির বর্ণনা, তার ঐশ্বর্য ধরা পড়েছে। আর এসেছে রামলাল চাকরের তত্ত্বধানে অবনীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠা, বিভিন্ন আদব কায়দা শেখার কথা।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঃ

অবনীন্দ্রনাথ 'এ-বাড়ি ও-বাড়ি' গল্পে তাদের বাড়ি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির গল্প শুনিয়েছেন। রামলালের কাছে থাকার সময়ই তিনি ও-বাড়িতে যাওয়ার ছাড়পত্র পান। বাড়ির চারিদিক ও মানুষদের সাথে মেলামেশার সুযোগ পান। ও-বাড়িতে কর্তামশায় পাহাড় থেকে বাড়ি ফিরলে বাড়ির সবাই তটস্থ হয়ে থাকত এবং বাড়ির পরিবেশ যেতো পাল্টে। এরই সাথে তিনি উল্লেখ করেছেন মাঘোৎসবের কথা, অন্ধভিক্ষুর গানের কথা, বরফওয়ালা, চুড়িওয়ালার ডাকের কথা। অবনীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে ওসব যেন এখন কলকাতা থেকে হারিয়ে গেছে।

বারবাড়িতে ঃ

রামলালেল ওপর অবনীন্দ্রনাথের দেখাশোনার ভার পড়ার সময় থেকেই অবনীন্দ্রনাথ বাড়ি থেকে বাইরে পা ফেলাতে সুযোগ পায়। এখানে আছে তারই কথা। তিনি যে ছোটোবেলায় খুব দুষ্ট ছিলেন তার বর্ণনা তিনি নিজেই দিয়েছেন। লালমাছে ভর্তি গামলার জলে লাল রং মেশানো, যার ফলে মাছ মরে যাওয়া, বাটালির কোপে বুড়ো আঙুল কেটে যাওয়ার কথা, দুষ্টুমি করলে অন্দরে বন্দি থাকার যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছেন। এরই সাথে এসেছে ছোটোপিসির কথা, যে ছিল তার ভরসার প্রধান স্থল।

অসমাপিকা ঃ

এখানে অবনীন্দ্রনাথ শুনিয়েছেন তাঁর হাতেখড়ি দেওয়ার ঘটনার কথা, মায়ের সাথে ছোটোপিসিমার শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে ধানের শীষ মুখে দিয়ে গলায় আটকে যাবার কথা, পেয়ারীবাবুর্চির দেওয়া পাঁউরুটি খেয়ে 'ব্যাপটাইজ' হয়ে যাওয়ার কথা। শেষে ছোটোপিসিমার আদেশে রামলাল তার মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে তাকে উদ্ধার করে।

বসতবাড়ি ঃ

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর তিনতলা বসতবাড়িটার কথা এখানে বলেছেন। মানুষ থাকলেই থাকে বাড়ির অস্তিত্ব, না হলে সেহয়ে পড়ে নির্জন নিষ্প্রাণ। মানুষের স্মৃতির মধ্যেই লালিত হয় বাড়ির স্মৃতি। আবার এই বাড়ি মারোয়াড়ীর হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। তাঁর ছবি, লেখা, গল্পের মধ্য দিয়েই এই বাড়ির স্মৃতি হয়তো বর্তমানে টিকে থাকবে বলে তিনি আশা করেন। নইলে, 'পুরনো স্কুলের মতো, হাওয়ায় উড়ে গেলে একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে'।

এইভাবেই 'আপন-কথা' রচনা থেকে অবনীন্দ্রনাথের বাল্যকাল ও সেই সময়কার ঠাকুর বাড়ির চালচিত্র অনেকটা বুঝে নেওয়া যায়।

মাসি

''১৩৬১ সালের আশ্বিন মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় 'মাসি'। প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। গ্রন্থের অন্তর্গত গল্পগুলি বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হয় নিম্নোক্ত ক্রমে ঃ

মাসি	১৩৪৯	শ্রাবণ-ভাদ্র
বনলতা	১৩৪৯	চৈত্র
হাতেখড়ি	১৩৫০	জ্যৈষ্ঠ

পত্রিকায় প্রকাশকালে 'মাসি অংশটির নাম ছিল 'মাসিমা'। গ্রন্থটির চিত্রালংকরণ করেন শ্রী পরিতোষ সেন। 'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ' বইটিতে (পৃঃ ১৮৫) শ্রীমতী রাণীচন্দ্র লিখেছেন —

'জোড়াসাঁকোর বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। বেলঘরিয়ার গুপ্তনিবাস বাড়ি নেওযা হল। বাগান, পুকুর - সব নিয়ে মস্ত সেই বাড়ি। দোতলায় প্রায় তেমনি চওড়া দক্ষিণের বারান্দা।'

অবনীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'সারাদিন বারান্দায় রোদের তাতে বসে রেলগাড়ি যাচ্ছে আসছে দেখি। আমার বাড়িমুখো গাড়ি আর আসবে না আমাকে নিয়ে যেতে। এই বাড়ির পুকুরধারটি ঠিক আমাদের

জোড়াসাঁকোর বাল্যকালের পুকুরধারের মতো দেখায়। এক-একবার ভুল হয়ে যায় যেন ছেলেবেলার দিনগুলো এসেছে। এই মজাটুকুই যথেষ্ট মনে করি। গল্পের দিন কি আর ফিরবে? বোধহয় তো আর সে বারান্দাও পাব না, সে হাওয়াও পাবে না মনের খেয়া নৌকোটা।'

গুপ্ত নিবাসে এসে 'মাসি' নামে একটি গল্প লিখলেন অবনীন্দ্রনাথ। মার বাড়ি থেকে মাসির বাড়ি এসেছেন, মার বাড়ি ছেড়ে আসার দুঃখ মাসির আদরে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে আসার বেদনা অনেকখানি ঢেলে দিয়েছেন এই লেখাতে। দিয়ে যেন খানিকটা হাল্কা হলেন। 'মাসি'-কে আমাদের পড়তে দিয়ে তিনি কুটুমকাটাম গড়তে মন দিলেন। দিন কয়েক পর লিখলেন, 'মাসিকে তোমাদের কাছে পরিচিত করে দিয়ে আমি খালাস। মাসিকে তোমাদের ভালো লাগছে জেনে সুখী হলাম'।''[৩৭]

ভূদের চৌধুরী তাঁর 'লিপির শিল্পি অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছেন — '' 'মাসি' (১৩৬১ বঙ্গাব্দ) গল্পটি কিন্তু মৌলিক; কিংবা অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয় বিধাতার সৃষ্টির 'সাঁটে' বাঁধা নতুন রচনা; শিল্পীর আপন হাতের আত্মসৃষ্টি। তিনটি গল্প, কিংবা গল্পাকৃতি চাতুর্য লীলার সমষ্টি 'মাসি' এবং গল্পগুলো প্রথম প্রকাশিত হয়েছে ১৩৪৯ সালের শ্রাবন-ভাদ্র সংখ্যা থেকে ১৩৫০ এর জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায়। — খ্রীস্টাব্দের তখন ১৯৪২-৪৩, অবনীন্দ্রকল্পনার কল্পপুরী ছিল দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ি। 'জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দা' — তার প্রতি নাড়ির টান বংশ পরম্পরায় ছিল শিল্পীর অস্থি-মজ্জা-রক্তে মিশে। শেষ বয়সে ওই ১৯৪২ — এই সেই 'বাড়ি' ছেড়ে বরানগরের গুপ্ত নিবাসের 'বাসা'য় শেষ জীবনটা কাটাতে চলে এলেন। মনে যে দুঃসহ ধাক্কা লাগল, চেতন মনের স্পষ্টতা থেকে মগ্ন মনের গহন পর্যন্ত — তাকেই আত্মস্থ করার শৈল্পিক প্রয়াস 'মাসি', - যার বাইরের আকার খেলা-খেলা মেজাজের জল্পনায় আবিষ্ট।''[৩৮]

অজিত কুমার ঘোষ 'মাসি' গল্প সম্পর্কে বলেছেন — '' 'মাসি' বইখানিতে তিনটি গল্প রয়েছে। তিনটি গল্পের মধ্যেই কাল্পনিক মাসির সঙ্গে লেখকের কথোপকথন চলেছে স্মৃতির দরজাগুলোর মধ্য দিয়ে রহস্যভরা বিচিত্র কক্ষে কক্ষে। অতীতের ফেলে আসা লোকগুলোর মধ্যে কোথাও খুঁজেছেন কৌতুকের উপাদান আবার কোথাও বা বেদনার পাত্র উজাড় করেছেন। স্মৃতির সরোবরে ডুব দিয়ে প্রবাল পালঙ্কে শায়িত মণিমালার কাছে উপস্থিত হয়েছেন, বস্তু জগতে ফিরে আসার ইচ্ছা যেন আর নেই।''[৩৯]

অবনীন্দ্রনাথ 'মাসি' গল্পে তাঁর বাল্যস্মৃতি ও পুরানো বাড়ি ছেড়ে আসা ও বাড়ির পরিবেশ পালটে যাওয়ার দুঃখ ব্যক্ত করেছেন মোট চারটি গল্পে।

মাসি ঃ

অবু ওরফে অবনীন্দ্রনাথ বরানগরের গুপ্ত নিবাস ছেড়ে জোড়াসাঁকোর বকুলতলার বাড়িতে গিয়েছেন মাসির খোঁজে। গিয়ে দেখেন সেই বাড়ির পুরাতন রূপ ছেড়ে নতুন ভাবে সেজে উঠেছে। পরে মাসির খোঁজ পেয়ে জানতে পারেন সেই বাড়ি অন্যজন কিনে নিয়েছে, আর মাসি তাই সেই বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। তারপর পুরানো কথা ছেড়ে অবু ও মাসি অন্য গল্পে চলে যায়।

দিশা ঃ

অবু মাসির বাড়ির ঠাকুর ঘরের সেবায়তের কাছে জলপান খেয়ে মাসির বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখে। তারপর সে মাসিকে জানায় এ বাড়িতে যেনো সেই পুরানো বাড়ির পরিবেশ সরে এসেছে। এর সাথেই মাসির সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে এসেছে 'ভূতপত্রীর দেশ' এর মুনশী বুড়োর কথা, হারুন্দে-মারুন্দের কথা। অবুর অশান্ত মনযোগ খানিকটা শান্তি পেয়েছে মাসির বাড়িতে এসে।

বনলতা ঃ

এই গল্পে আছে বনলতার বৈদূর্যলতা হয়ে ওঠার কাহিনী, যে অবুর 'মাসি' দামিনীকে দিদি বলে ডাকত। বনলতার বিয়ে হয়েছে জমিদারের সঙ্গে। তারপর সে আর মাসির সঙ্গে দেখা করতে পারে নি। সেই দুঃখের ইতিহাস মাসির মুখে শুনতে শুনতে অবুও যেন বনলতার দুঃখে একাত্ম হয়ে পড়ে; তার ইচ্ছে হয় বনলতা মাসিকে একটিবার দেখবার।

হাতেখড়ি ঃ

অবু তাঁর মাসির আঁকা একখানা ছবি দেখে এবং তাঁর কাছে জানতে চায় সে ছবি আঁকা কার কাছে শেখে। এই উত্তরে মাসি এড়িয়ে গিয়ে অবুকে ছবি আঁকার পাট অর্থাৎ হাতেখড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে। ছবি আঁকা সম্পর্কে মাসির মা-এর একটি কথাও তাকে শুনিয়ে দেয় — '' মা বললেন, 'পরে আসবে শিক্ষক, আগে নিজে নিজে দেখে শিখবে, তারপরে অন্যের কাছে বিদ্যে নিতে হবে','' — যাতে অবুও সায় দেয়।

এভাবেই 'মাসি'-র সমস্ত গল্প জুড়ে চলেছে অবু ও মাসির সুখ-দুঃখের কথা, স্বপ্ন-কল্পনার কথা। মাসির সাথে গল্পের মধ্য দিয়েই অবুর অশান্ত মন খুঁজে পেয়েছে শান্তির পরশ।

পথে বিপথে

''আটআনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ষট্‌ত্রিংশ গ্রন্থ হিসেবে 'পথে বিপথে'-র প্রথম প্রকাশ ১৩২৫ সালের চৈত্র মাসে। প্রকাশক ছিলেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন মাসে

প্রকাশিত হয় এ বইটির বিশ্বভারতী সংস্করণ। 'অবরোহন' নামের ছোটো অংশটি বিশ্বভারতী সংস্করণের সময় থেকে স্বতন্ত্র রচনাকারে মুদ্রিত হচ্ছে, এছাড়া এ দুই সংস্করণে অন্য কোনো প্রভেদ নেই। বানানে এবং মুদ্রণ পদ্ধতিতে অবশ্য কিছু ভিন্নতা আছে। গ্রন্থ ভুক্ত হবার আগে বইটির অন্তর্গত রচনাগুলি যেভাবে প্রকাশি হয়েছিল, তার একটি পরিচয় নিচে দেওয়া হল।

মোহিনী	ভারতী	১৩২৩	চৈত্র
অস্থি	ভারতী	১৩২৪	শ্রাবণ
গুরুজি	ভারতী	১৩২৪	জৈষ্ঠ
টুপি	ভারতী	১৩২৪	ভাদ্র
দোশালা	ভারতী	১৩২৪	আশ্বিন
মাতু	ভারতী	১৩২৪	বৈশাখ
শেমুষি	ভারতী	১৩২৪	আষাঢ়
ইন্দু	ভারতী	১৩২৪	কার্তিক
অরোরা	ভারতী	১৩২৪	অগ্রহায়ণ
পর-ই-তাউস	ভারতী	১৩২৪	পৌষ
ছাইভস্ম	ভারতী	১৩২৪	মাঘ
লুকিবিদ্যে	ভারতী	১৩২৪	ফাল্গুন
গমনাগমন	সবুজপত্র	১৩২১	জ্যৈষ্ঠ
নিষ্ক্রমন	ভারতী	১৩২২	চৈত্র
আরোহন	ভারতী	১৩২৩	বৈশাখ
বিচরণ	ভারতী	১৩২৪	আষাঢ়
অবরোহন	ভারতী	১৩২৪	আষাঢ়

লক্ষনীয় যে গ্রন্থে রচনাগুলির বিন্যাস সর্বত্র প্রকাশকাল অনুযায়ী নয়। নদীনীরে, সিন্ধুতীরে এবং গিরিশিখরে এই তিন শিরোনামে রচনাগুলির পর্যায় ভাগ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণেই পরিকল্পিত।''[৪০]

অজিত কুমার ঘোষ তাঁর 'সাহিত্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে জানিয়েছেন — '' 'পথে বিপথে' ও 'বুড়ো আংলায়' পার্থিব বস্তুর সঙ্গে অপার্থিব রহস্য মিলিত হয়েছে।''[৪১]

ভবানী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে বলেছেন — '' 'পথে বিপথে' স্মৃতিচারণামূলক রচনা। 'পথে বিপথে'-র বর্ণনা ভঙ্গীও কাব্যধর্মী এবং চিত্রময়।''[৪২]

ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'লিপির শিল্পি অবনীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে জানিয়েছেন — '' 'পথে বিপথে' (১৩২৫)-র অধিকাংশই বরং শিল্পীর অন্তঃপ্রবাহিত 'ফ্যান্সী' আর 'ফ্যান্টাসি'র মিশোল খেলা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কঠিন রোগ থেকে সেরে ওঠার পর নিত্য জলভ্রমণ ছিল অবনীন্দ্রনাথের প্রতি চিকিৎসকের নির্দেশ। ফেরি জাহাজে করে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে রোজ বেড়িয়ে বেড়াবার সময়ে অনেক লোক, প্রকৃতির অনুপম বৈচিত্র্য, রঙে-রসে তাঁর শিল্পি-মনকে টেনেছিল। সেই খুশির আবেশে অজস্র কথার ফুলঝুরি খেলেছেন, — আপাত আবোল-তাবোলের ছদ্মবেশে আসলে যা সেই পরাবাস্তব-রসে বিভোর শিল্পি মনের আনন্দ বিচ্ছুরণ। এইসব আপাত গল্পের দুটি মাত্র স্থায়ী। এক লেখক, কিংবা বলা ভাল গল্প-বলিয়ে, আর এক তাঁর বন্ধু অবিন।''[৪৩]

অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দক্ষিণের বারান্দা' গ্রন্থে জানিয়েছেন — ''দাদামশায় বন্ধু অবিনাশ চক্রবর্তীর কথা 'পথে বিপথে' বইতে আছে। অবিনাশবাবুর সঙ্গে দাদামশায় স্টীমারে চড়ে বাবুঘাট থেকে এঁড়েদার শিবতলা পর্যন্ত গঙ্গার হাওয়া খেয়ে এক সময় নিয়মিত বেড়াতেন। আমরাও কতবার গেছি দাদামশায়ের সঙ্গে এই স্টীমার সফরে। অবিনাশবাবু এসে উঠতেন পান-দোক্তা নিয়ে। দাদামশায় একটা মোটা বর্মা চরুট ধরিয়ে বসতেন স্টীমারের সামনের অংশে। ... 'পথে বিপথে'-র বহু গল্প এই স্টীমার অভিযানকে নিয়ে লেখা।''[৪৪]

আবার প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' প্রবন্ধে বলেছেন — ''এমন কি পথে-বিপথের (১৯১৯) মতো বই, যাহার অধিকাংশ গঙ্গায় স্টিমার - বেড়ানোর গল্প যাত্রা। লেখকের কলমের জাদুকাঠিতে তাহাও রূপকথার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অতিশয় কঠিন কাজ। এক পা সত্যের নৌকায় আর এক পা রূপকাথার নৌকায় রাখিয়া চলার মতো কঠিন কাজ আর কিছু আছে বলিয়া জানি না। আনাড়ির যাহাতে পদে পদে পতনের আশঙ্কা, অবনীন্দ্রনাথের তাহাতে ওস্তাদির অন্ত নাই। স্বপ্ন ও সত্যের মিশ্রণে তাঁহার যেমন কৃতিত্ব এমন আর কিছুতে নয়। এই বিষম ধাতুতে তৈয়ারী তাঁহার 'ভুতপত্রীর দেশ', 'বুড়ো আংলা', 'খাতাঞ্চির খাতা'। এমন কি 'পথে-বিপথে'ও এই বিষমের রচনা। সত্য কথা বলতে কি অবনীন্দ্রনাথ সত্য ও স্বপ্নের সীমান্ত প্রদেশের লেখক, এই দুই জগতের খবর তাঁহার রচনায় যেমন পাই এমন তো আর কোথাও দেখি না।''[৪৪]

ডাক্তারদের পরামর্শ মতো অবনীন্দ্রনাথ প্রতিদিন গঙ্গার ঘাটে স্টীমারে চেপে হাওয়া খেতে বেরাতেন। সাথে থাকত বন্ধু অবিনাশ গাঙ্গুলী। 'পথে বিপথে'-র গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে সেই সব কথা তার সঙ্গে ধরা পড়েছে গঙ্গার মায়াবী পরিবেশ, প্রকৃতির অপরূপ শোভা। 'পথে বিপথে' তে রয়েছে এমন সতেরোটি গল্প।

মোহিনী ঃ

কথক অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্টীমারে তাঁর বন্ধু অবিনের দেখা হয় এবং অবিন লেখককে তাঁর কাছে সংগ্রহীত 'মোহিনী' নামে ছবিটির বর্ণনা দিতে থাকে। অবিন তাঁর পুরানো ঘরের সমস্ত কিছু সরিয়ে দিলেও সেই ছবিটিকে রেখে দিয়েছিলেন, যেটা তার অন্তরের অন্তরতম স্থলে স্থান করে নিয়েছে।

অস্থি ঃ

কথক অবনীন্দ্রনাথ ও অবিন যখন জাহাজে চড়ে বেড়াচ্ছিল, তখন একজন লোকের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। এদের পাশাপাশি এক ইংরেজও ওঠে জাহাজে এবং সেই লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে জাহাজে থাকার কারণ। তখন লোকটি জানায় এই জাহাজটি তার ছিল, বেচে দেওয়ার পরও তার মায়া ছাড়তে পারে নি বলে তার এই জাহাজে ওঠা। লোকটির হাতে ছিল ঘড়ি ও চেন, যা অবিন তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর লেখক সেই লোকটির মুখে তার বংশের কাহিনী শুনতে থাকেন। এর পরের দিন অবিনের সাথে লেখকের দেখা হলে লেখক বুঝতে পারেন তিনি এতক্ষণ স্বপ্নে ছিলেন। তাঁর লেখায় এই স্বপ্ন ও সত্যের মিশেল প্রায়শই দৃশ্যমান হয়।

গুরুজি ঃ

লেখক তাঁর বন্ধু অবীনের গুরুকে দেখতে রাজার বাড়িতে গাড়িতে করে যাবার পথে গাড়িটি উল্টে যাওয়ার ফলে লেখক মাথায় চোট পান। এরপর তিনি স্বপ্নে অবীনের গুরুকে দর্শন করেন। যবন গুরুর পদধূলিতে লেখকের ঘৃণা থাকলেও তিনি তাঁর দেওয়া আহার সামগ্রী গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। তারপর তিনি গুরুর কাছ থেকে শোনেন পুরাণের গল্প।

টুপি ঃ

লেখক ভিড়ে ঠাসা স্টীমারে চেপে বেরিয়ে ছিলেন গঙ্গার হাওয়া খেতে। মানুষের মাথা ছাড়া তার চোখে ধরা পড়েছিল আকাশে প্রজ্জ্বলিত 'খাট্টাই টুপির মতো' আধখানা সূর্য। সেই সময় তাঁর বন্ধু লেখককে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যায় জাহাজের ফাঁকা জায়গায়। অবনিরে মাথা থেকে হাওয়াতে উড়ে যাওয়া টুপি, যেটা আসলে ছিল লেখকের তা তিনি ধরতে গেলে জাহাজের এক খালাসি হেসে ওঠে। তারপর সেই খালাসি ছোকরাটি লেখকদেরকে শোনায় তার টুপি পরার গল্প।

দোশালা ঃ

এখানে স্টীমারে ফেলে যাওয়া এক শালকে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়েছে। লেখক ও তাঁর বন্ধু স্টীমারে একটি শাল ঝুলে থাকতে দেখে এবং লেখকের নিষেধ সত্ত্বেও অবিন সেটি বাড়ি নিয়ে চলে

যায়। তার কিছুদিন পর সে শালটি আবার স্টীমারে নিয়ে এসে এক কাবুলির গানে মুগ্ধ হয়ে তাকে দিতে যায়। লেখক বাধা দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত সে শালটি রেগে গিয়ে জলে ফেলে দেয়। কিন্তু শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে সেই শালটির উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য মুগ্ধ করেছিল।

মাতু ঃ

লেখক এখানে 'মাতু' নামে এক বড় জাহাজের ঘটনার কথা শুনিয়েছেন। লেখক অবিনের সঙ্গে সেই জাহাজের মীরসাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে যায়। আর মীরসাহেব তাদেরকে শোনায় সিঙ্গাপুর-হংকং, সেকেন্দ্রায় জাহাজে ঘুরে বেড়ানোর গল্প, তার মায়ের কথা, তার কাছে থাকা এক মা হারা শিশুর কথা। অবনীন্দ্রনাথ তাদের সাথে যেন একাত্ম হয়ে যান।

শেমুষি ঃ

অবিন লেখককে শেমুষি অর্থাৎ বুদ্ধিমন্ত জীবের গল্প শুনিয়েছে। যারা নাকি ইচ্ছে করলে সব কিছুই করতে পারে। ঘটি চালনো, বাটি চালানো থেকে ঘুমের দেশের রাজকন্যাকেও তারা কাছে এনে দিতে পারে। আবার এই শেমুষিকে তাড়ানো যায় বনমানুষের হাড়ের বাঁশির সুর ও গান ধরে।

ইন্দু ঃ

লেখকের বন্ধু অবিনের একটি লাঠির গল্প শুনিয়েছেন লেখক। লাঠিটির নাম ছিল 'ইন্দু'। আসলে এই লাঠিটি অবিনের স্ত্রী মারা যাবার সময় তাঁকে দিয়ে যায়।

অরোরা ঃ

লেখক ও তাঁর বন্ধু অবিন অরোরা নামে এক মেয়ের অভিসারে বেড়ানোর গল্প শুনিয়েছিল। কল্পনায় অনুভব করেছেন অরোরার অস্তিত্ব। তারপর তাঁর ডাক্তার এসে লেখকে গল্প লেখা বন্ধ করে জাহাজে বেড়িয়া আসার পরামর্শ দেয়।

পর্-ঈ-তাউস্ ঃ

লেখক কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করেছেন বন্ধু অবিন ও জাহাজের এক ময়ূরপুচ্ছধারী লোকের সঙ্গে। লেখক ভাবছেন তারা পাখনার সাহায্যে উড়ে চলেছেন পক্ষীরাজের রাজ্যে, যেখানে আছে রামধনুক, পরীরা। শেষমেষ আবার তিনি জাহাজে ফিরে এসেছেন। কিন্তু বন্ধু অবিনকে তিনি দেখতে পাননি। আর পর্-ঈ-তাউস্ আসলে কাশ্মীরের পরীতোষ শাল, যেটা লেখকের গায়ে ছিল।

ছাইভস্ম ঃ

লেখক এখানেও কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করেছেন। তিনি ভাবছেন এক সন্ন্যাসীর হাত ধরে

তিনি হরিদ্বারে কুম্ভস্নান করতে গেছেন। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসার পথে তাঁর বন্ধু অবিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং তাঁর দুজনে গয়া ঘুরে এসে পনটুনের জাহাজে এসে উঠে বসে। স্বপ্নের জগৎ থেকে লেখকের বাস্তবের মাটিতে পা রাখার কাহিনী।

লুকিবিদ্যে ঃ

লেখক ও অবিন কর্তামশায়ের আঙুলে লুকিবিদ্যের আংটি কীভাবে তার আঙুলে এসে আটকে রইল তার গল্প শুনতে চায়। কর্তামশায় সেই গল্প শোনাতে গিয়ে কবিরাজি শাস্ত্র, ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস, মিশনারিদের জুয়োচ্চুরি প্রভৃতি বিভিন্ন গল্প শোনালেও আংটির গল্প এড়িয়ে যায়।

গমনাগমন ঃ

আলোচ্য অংশে লেখকের কোর্ণাক যাত্রার বর্ণনা আছে। তাঁর এক মিশনারী বন্ধুর কোণার্ক সম্পর্কে অনীহা এবং অবহেলাই লেখককে ঐ স্থানে যেতে তীব্র আগ্রহী করে তোলে। কোণার্কের যাত্রাপথের বর্ণনা লেখকের কলমে ছবির রূপ নিয়েছে।

লেখকের মিশনারী বন্ধু লেখককে কোণার্ক যাত্রায় বারণ করলেও, লেখক পালকিতে করে কোণার্ক যাত্রা করেছেন। যাত্রাপথে এসেছে ভুতুড়ে উপলব্ধি, গা ছমছম পরিবেশ। এসেছে বিভিন্ন পথের বর্ণনা। যার বর্ণনা আমরা 'ভূতপত্রীর দেশ'-এ দেখতে পাই।

নিষ্ক্রমন ঃ

এই গল্পে দেখা গিয়েছে লেখকের কাল্পনিক মানস ভ্রমন। লেখক পথে যেতে যেতে দেখছেন প্রকৃতির মনোরম সব দৃশ্য, কুয়াশা দিয়ে ধোয়া। এই সমস্ত পথ অতিক্রম করতে করতে লেখকের গাড়ি চলেছিল হিমালয়ের যে দিক দিয়ে গঙ্গা নেমেছে সেই দিকে।

আরোহন ঃ

রাজপুরের পান্থশালা থেকে লেখক হিমালয়ের পথে উঠে চলেছেন পালকিতে করে। যেতে যেতে পথের অপরূপ দৃশ্য লেখকের চোখ জুড়িয়ে দিচ্ছে। ঘন বনরাজির, পাহাড়ি ঢালু পথ, কুয়াশার চাদর লেখকের প্রাণে আনছে আনন্দ। রচনাটি যেন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথের তুলির টানে লেখা ছবি।

বিচরণ ঃ

হিমালয়ের পাহাড়ি পথে লেখক বিচরণ করেছেন। পাহাড়ে প্রকৃতি বিভিন্ন ঋতুতে নব নব ভাবে নিজেকে সাজিয়ে তোলে, যা লেখকের চোখ এড়ায়নি। বসন্তের আগমনে গাছেদের ফুলে ভরে ওঠা, আবার শীতের আগমনে বরফে তাদের ম্লান রূপ — দুই দৃশ্যই লেখকের চোখে ধরা পড়েছে।

অবরোহন ঃ

লেখক 'পথে বিপথে' ঘোরাঘুরি করে অবশেষে নেমে এসেছেন পাহাড়ের নীচে, নিজের গন্তব্যস্থলের দিকে।

এভাবেই 'পথে বিপথে'র সমস্ত গল্প জুড়ে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ — দুভাবেই ধরা দিয়েছেন।

স্বর্গগত শ্রীমদ্ ওকাকুরা ঃ

স্মৃতি কথাটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। জাপানী চিত্রশিল্পী ওকাকুরা জাপানের চিত্রকলায় যে নব জোয়ার এনেছিলেন তারই কথা আছে এই রচনায়। আর আছে ভারতের সঙ্গে তার যোগাযোগ এর কথা।

ভারতীর ছবি ঃ

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিশ বছরের আগে পর্যন্ত লেখকরা 'ভারতী' তে প্রকাশিত ছবি বা লেখালেখি দেখতে পেতেন না, বছরের একটি দিন ছাড়া, তার কথাই আছে এই স্মৃতিকথাতে।

অবনীন্দ্রবাবুর পত্র ঃ

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এই স্মৃতি কথাটি প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনের সফলতা, বিফলতার কথা টুকরো টুকরো ভাবে ব্যক্ত করেছেন এই রচনায়। তিনি যে জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়ে দিয়েছিলেন ছবি, গান, লেখালেখি করে — সে কথাও বলেছেন।

চিঠি ঃ

১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৪ মাঘ 'বুধবার' পত্রিকায় রচনাটি প্রকাশ পায়। এই রচানাটিতে অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও তার পারিপার্শ্বিক ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর কলমের আঁচড়ে সেই দৃশ্যগুলি যেন ছবি আকারেই ধরা দিয়েছে।

সত্যেন্দ্র ঃ

স্মৃতিকথাটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তার প্রতি অবনীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার্ঘ্য এই রচনা। এখানে কবির বিভিন্ন গুণাবলী লেখক ব্যক্ত করেছেন।

নাচঘরের আবহাওয়া ঃ

রচনাটি 'নাচঘর' পত্রিকায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৯ই জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাংশে অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দেশে থিয়েটারের বাড়বাড়ন্ত এবং যাত্রার তিরোধানের কারণের দিকটি দেখিয়েছেন।

বাংলা থিয়েটারের একটুকরো ঃ

রচনাটি 'নাচঘর' পত্রিকায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১৬ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত। এখানে বাংলার নাচঘরের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। লেখক মনে করেন নাচঘরের সঠিক ইতিহাস লেখা হয় নি। আর এ প্রসঙ্গে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্র উল্লেখ করে সেই সময়ের ইতিহাস তুলে ধরেছেন।

স্মৃতির পরশ ঃ

'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্মিত রাঁচির গৃহ 'শান্তিধাম' এবং বোলপুরে অবস্থিত 'শান্তিনিকেতন' — এই দুই গৃহই লেখকের মনে চিরশান্তি এনে দিত।

বড়ো জ্যাঠামশাই - ১ ঃ

১৩৩২ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত। এই রচনায় লেখক তাঁর বড়ো জ্যাঠামশাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন। তাঁর রচিত 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের প্রভাব লেখকের মনকে এখনো চিত্রপুরের রাজ্যে নিয়ে যায়।

জগদিন্দ্রনাথ স্মরণে ঃ

'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকার ১৩৩৩ ফাল্গুন সংখ্যায় স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের মহানুভবতার দিকটি তুলে ধরেছেন এই স্মৃতিকথায়। তিনি মনে করেন স্মরণ সভায় মানুষের স্মৃতিচারণা সঠিকভাবে করা যায় না, স্মৃতি থেকে যায় মনের অন্তরতম স্থানে।

ব্যাপটাইজ ঃ

স্মৃতিকথাটি 'ল কলেজ ম্যাগাজিনে' ১৩৩৯ এর বৈশাখে প্রকাশিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটোবেলায় এক সাহেবের কাছ থেকে মাখন পাউরুটি খেয়ে কিভাবে 'ব্যাপটাইজ' হয়ে গিয়েছিল এবং শেষে গঙ্গাজল নিয়ে তার থেকে উদ্ধার হওয়ার ঘটনা এই স্মৃতিকথায় শুনিয়েছেন।

শিল্পী শ্রীমান নন্দলাল বসু ঃ

'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত। 'বিচিত্রা'য়

প্রকাশিত নন্দলাল বসুর ছবিগুলি সম্পর্কে এই স্মৃতিকথায় অবনীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রধান শিষ্যের শৈল্পিক ক্ষমতারও প্রশংসা করেছেন।

বড়ো জ্যাঠামশায় - ২ ঃ

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই রচনাতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বড়ো জ্যাঠামশায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেছেন। তাঁর 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের কথা, তাঁর ছেলে মানুষী ও সরলতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্য এর কথা প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।

আবহাওয়া ঃ

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকাতে প্রকাশিত স্মৃতিকথাটি 'অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন' গ্রন্থে পরবর্তী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়। অবনীন্দ্রনাথ এই রচনায় পুরাতন যুগের আদব-কায়দার সঙ্গে নতুন যুগের আদব-কায়দার তুলনা করেছেন। এখনকার সবকিছুই যেন এলোমেলো, আগোছালো বলে তাঁর মনে হয়েছে। এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথই পুরানোর সঙ্গে নতুনের যোগসাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে তাঁর অভিমত।

শিশুদের রবীন্দ্রনাথ ঃ

'রংমশাল' পত্রিকায় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই স্মৃতিকথায় রবীন্দ্রনাথের শিশুদের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তা ব্যক্ত হয়েছে। শিশুদের পাঠ্য বই এর অভাব বোধ করে রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং অবনীন্দ্রনাথকে দিয়ে অনেক বই লিখিয়ে ছিলেন, যা 'বাল্য গ্রন্থাবলী সিরিজ'-এ প্রকাশ পায়।

আমাদের সেকালের পুজো ঃ

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের 'শারদীয়া আনন্দবাজার' -এ প্রকাশিত। কয়লাহাটার রাজা রামানাথ ঠাকুরের বাড়ির পুজো এবং সেখানে বসা যাত্রার আসর সম্পর্কে এই স্মৃতিকথায় অবনীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন।

আমাদের পারিবারিক সংগীত চর্চা ঃ

১৩৫০ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গীতিবিতান বার্ষিকী' পত্রিকায় এই স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়। এই রচনায় পাথুরে ঘাটার বাড়ি ও জোড়াসাঁকোর বাড়ির সংগীত চর্চার কথা আলোচিত হয়েছে। জোড়াসাঁকোর এই সংগীতময় পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র সংগীতের বিকাশ পূর্ণতা পায়।

ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ ঃ

স্মৃতিকথাটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩৫০ এর পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দেশের আর্ট ও

আর্টিস্টদের প্রতি তাঁর যে দরদ ও দায়বদ্ধতা ছিল তার কথাই এই স্মৃতিকথায় লেখক বলেছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর 'প্রবাসী' পত্রিকাতেই অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের ছবি ছাপা হয়ে বের হয় এবং তার ফলে সেই ছবি দেশের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়।

শিশু বিভাগ ঃ

১৩৫২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত মৈত্রেয়ীদেবী সম্পাদিত 'পঁচিশে বৈশাখ' সংকলন গ্রন্থে স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়। শান্তিনিকেতনে শিশুদের জন্য আলাদা করে রবীন্দ্রনাথ 'শিশু বিভাগ' খুলেছিলেন। কিন্তু সেই বিভাগের শিখন পদ্ধতিতে অবনীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নি, তিনি তা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েও ছিলেন।

হারানিধি ঃ

১৩৫৪ বঙ্গাব্দে 'অঞ্জলি' (দেব সাহিত্য কুঠির বার্ষিকী)-তে স্মৃতিকথাটি প্রকাশিত হয়। হারানো জিনিস যে একেবারেই হারিয়ে যায় না, ধৈর্য্য ধরলে আবার সে কাছে ফিরে আসে তার কথাই লেখক বলেছেন। তাঁর কিছু ব্যক্তিগত জিনিস হারিয়ে গেলেও সেগুলোকে পরে আবার তিনি ফিরে পেয়েছিলেন।

পুরাতন লেখা ঃ

লেখাগুলি সুরূপাদেবী রক্ষিত খাতা থেকে সংগৃহীত। এই স্মৃতিকথায় অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলেবেলার টুকরো টুকরো বিভিন্ন ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের থিয়েটার অভিনয়, বাগান নির্মাণ, বালির ঘর তৈরী, শিকার, ভূতের ঘর, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি নিয়ে কৌতূহলের কথা ব্যক্ত করেছেন।

—০—

তথ্যসূত্র

১) ঘরোয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী, ১৯৭৩, পৃঃ ৩৫৬।

২) ঘরোয়া, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৬-৩৫৭।

৩) ঘরোয়া, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ৩৬২।

৪) ঘরোয়া, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ৩৬২।

৫) দে বিশ্বনাথ, অবনীন্দ্র স্মৃতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃঃ ৫০।

৬) ঘরোয়া, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী, ১৯৭৩, পৃঃ ৬২।

৭) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ৬২।

৮) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ৬৫-৬৬।

৯) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭০।

১০) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ৭২।

১১) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ৭৫।

১২) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ১০২।

১৩) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ১০৭।

১৪) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

১৫) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ১২০-১২১।

১৬) ঘরোয়া, পূর্ববৎ খণ্ড, পৃঃ ১২৪।

১৭) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী, ১৯৭৩, পৃঃ ৩৬৩।

১৮) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ৩৬৩-৩৬৪।

১৯) দে বিশ্বনাথ, অবনীন্দ্র স্মৃতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃঃ ৪১-৪৩।

২০) জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী, ১৯৭৩, পৃঃ ১৬০।

২১) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৪-১৬৫।

২২) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৮।

২৩) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৫-১৭৬।

২৪) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ১৮০।

২৫) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২০১।

২৬) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২০২-২০৩।

২৭) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২১৯।

২৮) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২২৬।

২৯) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২৩০।

৩০) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২৪০-২৪১।

৩১) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৪-২৬৫।

৩২) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৫।

৩৩) জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২৯২।

৩৪) আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ৩৫৫-৩৫৬।

৩৫) চৌধুরী ভূদেব, লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, ৯ আশ্বিন, ১৩৮০, পৃঃ ১৪১।

৩৬) আপন কথা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (প্রথণ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ১৯৭৩, পৃঃ ১১।

৩৭) মাসি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ২৩০।

৩৮) চৌধুরী ভূদেব, লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, ৯ আশ্বিন, ১৩৮০, পৃঃ ১৩৭-১৩৮।

৩৯) দে বিশ্বনাথ, অবনীন্দ্র স্মৃতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃঃ ২০৮।

৪০) পথে বিপথে, অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জুন ১৯৭৯, পৃঃ ২২৫।

৪১) দে বিশ্বনাথ, অবনীন্দ্র স্মৃতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃঃ ২০৬।

৪২) দে বিশ্বনাথ, পূর্ববৎ গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৬।

৪৩) চৌধুরী ভূদেব, লিপির শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, জিজ্ঞাসা, ৯ আশ্বিন, ১৩৮০, পৃঃ ১০৮।

৪৪) গঙ্গোপাধ্যায় মোহনলাল, দক্ষিণের বারান্দা, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, বিশ্বভারতী সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃঃ ১৩৮-১৩৯।

৪৫) দে বিশ্বনাথ, অবনীন্দ্র স্মৃতি, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯, পৃঃ - ৪৬-৪৭।

—০—

প্রবন্ধ

বাংলার ব্রত (১৯১৯) ঃ

‘‘ ‘বাংলার ব্রত’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সনে (১৯১৯)। প্রথম সংস্করণে অবশ্য কোনো তারিখ উল্লেখ করা নেই। প্রকাশক ছিলেন প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা। নামপত্রের উল্টোদিকে উল্লেখ ছিল, কান্তিক প্রেস, ২২, সুকিয়া স্ট্রিট, কলিকাতা, কালাচাঁদ দালাল কর্তৃক মুদ্রিত। গ্রন্থ হিসেবে এটি বেশ বৃহদাকার। মোট ৬২ পৃষ্ঠার রচনা, তারপর ২ পৃষ্ঠাব্যাপী আলপনার সূচি এবং রঙিন ছবির সূচি। শেষাংশে ১২০ পৃষ্ঠার পাতার একপিঠে এক-একটি আলপনার ছবি (মোট ২৪০ পৃষ্ঠা)। এছাড়াও বইটির গোড়ায় লেখকের ‘নিবেদন’ অংশ রয়েছে। আর রয়েছে, বইয়ের মুখপাত এবং ৫৬ পৃষ্ঠা ৫৭ পৃষ্ঠার মাঝে একটি - একটি মোট দুটি রঙিন ছবি। মুখপাতের ছবিটি ‘ বৌছত্র, তারাব্রতের নমুনা’ এবং দ্বিতীয়টি ‘একটি পিঁড়িচিত্রের নমুনা’। বইটির বিক্রয়মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে - আড়াই টাকা। পরবর্তীকালে, বিশ্বভারতী থেকে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।।৪ হিসেবে ‘বাংলার ব্রত’ প্রকাশিত হয় ১ শ্রাবণ ১৩৫০ সনে। এই সংস্করণে প্রথম সংস্করণের বেশ কিছু অংশ বর্জিত হয়, ছোটোখাটো কয়েকটি মুদ্রণ পরিবর্তন, শব্দ পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সংস্করণের ‘নিবেদন’ অংশটিও বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহটিতে পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ সংস্করণটি আকারে ছোটো, পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ৭৯। প্রথম সংস্করণের আপলনা - চিত্রের সম্ভার এ পুস্তিকায় নেই। মাত্র ১২টি নকশা সাদা-কালোয় রচনা পৃষ্ঠার পাশে বা মাঝখানে প্রথম সংস্করণ থেকে ব্যবহৃত। এগুলি হল যথাক্রমে লক্ষ্মীপূজার মাঝের খুঁটির গোড়ার আলাপনা (১৩), বসনভূষণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মী পেঁচা ইত্যাদি (১৭), লক্ষ্মীর পদচিহ্ন (২০), কলমিলতা (১০১), সেঁজুতি ব্রতের আলপনা (৬৭), চণ্ডীমণ্ডপের আলপনা (৭৭), জোড়া মাছ (৮১), সুবচনীর হাঁস (৭৪), হাতে-পো কাঁখে পো (৭৯), বরযাত্রার পদ্ম (৩), খুন্তিলতা (১১০), শঙ্খলতা (১০৩)। বন্ধনীর মধ্যে প্রথম সংস্করণের আলপনার সূচিসংখ্যা। রচনাবলীতে বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ ।।৪ অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ্যটিই গৃহীত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ।।৪ বা
দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত অংশ।

নিবেদন

কুড়ি কি বাইশ বৎসর পূর্বে ‘সাধনা’ পত্রিকায় শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সর্ব প্রথম বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়া ও মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করেন। সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত

মেয়েলি ব্রতের সম্বন্ধে যত সন্ধান বাংলায় প্রকাশ হয়েছে, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার মহাশয়ের 'ঠানদিদির থলে বা বাঙ্গালার ব্রতকথা' খানিতেই আমাদের কুমারী-ব্রতগুলিকে, আচার অনুষ্ঠান উপকরণ প্রকরণ সব দিক দিয়েই, যথাসম্ভব অবিকল ভাবে সাধারণের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে।

আজ দুই তিন বছর ধরে 'বিচিত্রা সভার' জন্য আমার ছাত্র ও বন্ধুদের সাহায্যে যতগুলি ব্রতের আলপনার নক্সা সংগ্রহ করেছি, প্রায় সকলগুলিই এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। কি মণ্ডনচিত্র হিসাবে, কি স্বকীয়তা পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের হাতের এই লেখা শিল্পী মাত্রেরই যে আদর পাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নক্সাগুলি আমি যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে নকল করে প্রকাশ কল্লেম; কেবল আলপনাগুলি আঙুলের ডগায়, আর এগুলি তুলির আগায় — সেগুলি সাদা রেখা সহজে একটু অযত্নে টানা, আর এগুলি কালির টান একটু যত্ন করে ধরে লেখা — এ যা প্রভেদ। আমি বাঁককে অল্প একটুখানি সোজা, বালিকার আঙুলে যেখানে যেখানে কেঁপেছে সেই সেই খানে একটুখানি ধীর ভাবে টেনে যাওয়া ছাড়া আলপনাগুলিতে আর কোন অদল-বদল ঘটতে দিইনি। আসলে পাকা হাতের আর কাঁচা ও কচি আঙুলের লেখায় যে তফাৎ সেটা রইল। আসল আলপনাগুলির মধ্যে যে প্রেরণা আর গতি আমার নকলগুলির মধ্যে সেটা অনেকখানি বাদ পড়ল, সহজে টানার আলোল শ্রীটুকু সংযতন রেখায় কেমন করে প্রকাশ করি? হয়তো সাধারণে পাকা হাতের টানা আলপনাগুলিই ভালো বলে ভুল করবেন এবং ভয় হয়, হয়তো বইখানি পল্লিগ্রামের কোনো একটি ছোটো মেয়েকে একুট ধরে ধরে আলপনা দেবার চেষ্টা করাতেও পারে; সেইজন্য বলে রাখা দরকার আলপনার সচল রেখা অচল হয়ে পড়বে, যদি সেগুলিকে রুল কম্পাস কিম্বা সুতো ধরে আঁকার চেষ্টা হয়। বিনা চেষ্টায় হাত থেকে বেরিয়েছে, আলপনার এটা একটা গুণ, দোষ নয় — 'Lines suggest movement and it suggest best when the Fluctuations are not Matheonatically accurate' — হাতের লেখা চিঠিখানি আর ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র দুয়ে যতটা প্রভেদ, ধরে চিত্রকরা আর নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে আলপানা দিয়ে যাওয়া ততখানি ভিন্নতা।

আলপানা সংগ্রহের সময় অনেক মেয়ে 'ছাই আঁকা, একটি পাঠাবার যোগ্য' এই বলে আপত্তি তুলেছিলেন এবং তাঁদের হাতে লেখা প্রায় সকল পাত্রীই বেনামি অবস্থায় আমার কাছে এসেছে; কিন্তু তাঁদের সবাইকেই আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। বাংলার ঘরের মেয়েরা বধূরা সব-রকমই রেখা টেনেছেন, সোজা বাঁকা সকলগুলিই সুন্দর। তাঁদের না-শেখার লেখা আর্টস্কুলের পাকা হাতের লেখাকে হার মানিয়েছে। পুরুষের হাতের পরশ এক, মেয়েদের হাতের পরশ আর একটি, মেয়েদের যদি চিত্র শেখাতে হয় তবে আলপনা দিয়েই তার গোড়া-পত্তন করতে হবে।

শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"[১]

বাংলা সাহিত্যাকাশে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এক বিশিষ্ট অবদান আছে। এই বংশের সন্তান রবীন্দ্রনাথ প্রথম লোকসংস্কৃতির সংকলক ও সংগ্রাহক রূপে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। আর সেই বংশেরই উত্তরসূরী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই ধারাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যান। অবনীন্দ্রনাথের এই ধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ 'বাংলার ব্রত' — যা লোকসংস্কৃতির গবেষণামূলক গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। তিনি এই গ্রন্থে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্রত নিয়ে আলেচনা করলেও, লৌকিক ব্রতের উপরই বেশি আলোকপাত করেছেন। মেয়েলি ব্রতগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে। এরই পাশাপাশি তিনি ব্রতের ছড়ার চিত্ররূপ ও নাট্যরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন ব্রতের আলপনার শিল্পরূপ নিয়েও। আবার বেশিকিছু ব্রতের পরিচয়ও তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে। সব মিলিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার ব্রত' আমাদের বিন্দুতে সিন্ধুর দর্শন দেয়।

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

''স্যার আশুতোষের চেষ্টায় এবং খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের বদান্যতায় ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পাঁচটি নতুন অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয় ভারতীয় শিল্পকলার অধ্যাপনা সম্পর্কে 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদ তার মধ্যে একটি । শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথই যে ভারতীয় শিল্পকলার প্রকৃত ব্যাখ্যা করবার যোগ্যতম পণ্ডিত, সেকথা স্যার আশুতোষ বুঝেছিলেন এবং তিনিই তাঁকে 'রানী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' -এর পদে প্রথম অধ্যাপক রূপে বরণ করেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সকল বক্তৃতা তখনকার 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' পত্রিকায় পকাশিত হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে সেগুলি 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। শিল্পাচার্যের বাগেশ্বরী বক্তৃতাবলীর অন্তর্গত 'রস ও রচনার ধারা' প্রবন্ধটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে প্রকাশিত হয় নি। দ্বিতীয় 'রূপা' সংস্করণে (১৯৬৯) প্রবন্ধটি অন্তর্ভুক্ত হয়।''[২]

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-তে শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। অবলুপ্ত প্রায় ভারত শিল্পের মূল্যাদর্শকে ফিরিয়ে আনতে তিনি এই গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তবে শিল্পের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তত্ত্ব দিয়ে তাকে জটিল করে তোলেন নি, সহজ-সরল ভাষায়, সরস ভঙ্গীতে তার আলোচনা করেছেন। রচনাগুলি পড়তে পড়তে পাঠকও যেন এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্য আস্বাদন করে, কখনেই ক্লান্তি গ্রাস করে না। আবার আলোচনার প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের উদ্ধৃতিও ব্যবহার করেছেন। যা গ্রন্থের রসমাধুর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। তিনি যে ঊনত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন পর্যায়ক্রমে তা হল — শিল্পে অনধিকার, শিল্পে অধিকার, দৃষ্টি ও সৃষ্টি,

শিল্প ও ভাষা, শিল্পের সচলতা ও অচলতা, সৌন্দর্যের সন্ধান, শিল্প ও দেহতত্ব, অন্তর বাহির, মত ও মন্ত্র, শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালো মন্দ, রস ও রচনার ধারা, শিল্পবৃত্তি, সুন্দর, অসুন্দর, জাতি ও শিল্প, অরূপ না রূপ, রূপবিদ্যা, রূপ দেখা, স্মৃতি ও শক্তি, আর্য ও অনার্য শিল্প, আর্য শিল্পের ক্রম, রূপ, রূপের মান ও পরিমান, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ ম, সন্ধ্যার উৎসব, খেলার পুতুল।

সহজ চিত্রশিক্ষা

''এই পুস্তিকাটি বিশ্বভারতী থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৫৩ সনে। পুস্তিকার একেবারে শুরুতে বলা আছে, 'সহজ চিত্রশিক্ষা'-র চিত্রবলী আচার্য অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুসারে শিল্পী নন্দলাব বসু কর্তৃক অঙ্কিত। এই পুস্তিকার কোনো বিজ্ঞপ্তি বা ভূমিকা অংশ নেই।''[৩]

অবনীন্দ্রনাথের 'সহজ চিত্রশিক্ষা' গ্রন্থটি চিত্রশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। ছয়টি প্রকরণে ভাগ করে তিনি চিত্রশিক্ষার বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন।

প্রথম প্রকরণ ঃ টান-টোনের রহস্য ঃ

টান ও টোন উভয়ে মিলে কিভাবে একটা ছবি হয়ে উঠে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আর এটা করে উঠতে গেলে শিল্পীকে ছবির আকার-প্রকার, মান-পরিমান, ভাব-ভঙ্গি, রূপ-লাবণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। টান ও টোনের আছে নানা অবস্থা, নানা নাম।

দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ আকৃতির ছাঁদ ও বাঁধ ঃ

টান-টোন মিলে গিয়ে একটি ছাঁদের আকৃতি সৃষ্টি করে। আবার এই ছাঁদ প্রধানত দু'ধরনের — সকোণ ও নিষ্কোণ। যা সব আকৃতির মধ্যে থাকে। তবে ছাঁদ ও বাঁধের নিয়ম ধরেই সকোণ ও নিষ্কোণ ছাঁদ নানা আকার ধরে শোভা পায়। এই ছাঁদ-বাঁধের নিয়মের নাম অবনীন্দ্রনাথ দিয়েছেন — 'এক-দুই-তিন নিয়ম' কিংবা 'সমান-অসমান-বেসমানের নিয়ম।'

তৃতীয় প্রকরণ ঃ আঁকা-জোঁকার তাল-মান ঃ

এই অংশে তিনি আলোচনা করেছেন আঁকা-জোঁকার তাল মান নিয়ে। মানুষ, পশু সবাই তাদের নিজস্ব মাপজোপ নিয়ে নিজেদের আকার ধারণ করে। একা একা যখন সবাই অবস্থান করে, তখন সবাই তারা নিজস্ব পরিমান নিয়ে দেখা দেয়। কে কার চেয়ে বড়ো-ছোটো বোঝা যায় না, কিন্তু অপরের পাশে তাকে স্থাপন করলেই কে বড়ো, কে ছোটো তা বোঝা যায়। তাই ছবি আঁকার সময় মাপজোপ নিয়ে সচেতন থাকতে হয়।

চতুর্থ প্রকরণ ঃ চিত্রে ভাব-ভঙ্গি ঃ

আলোচ্য অংশে চিত্রের ভাব-ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছেন। লেখক জানাচ্ছেন আগে মানুষের ছবি লিখে মনের ভাব জানাতে অনেক সময় লাগতো বলে সে সৃষ্টি করল অক্ষর। তবে অক্ষরকে চেনবার ক্ষমতা থাকতে হবে, নাহলে লেখার ভাব বোঝা যাবে না। অপর দিকে চিত্রের অক্ষরের বেলায় ভুল হবার জো নেই। চিত্র দেখে তা কিসের আমরা সহজে ধরতে পারি।

পঞ্চম প্রকরণ ঃ চিত্রে রঙ-ঢঙ ঃ

ছবিতে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এই অংশে। ছবির উপর রঙ মানানসই না হলে তার সৌন্দর্য ও স্পষ্টতা প্রতীয়মান হয় না। আবার রং তৈরী করার কৌশল ও তার উপযুক্ত ব্যবহারও জানা প্রয়োজন। একই কথা নানা সুরে বললে যেমন বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পায় তেমনি একই বস্তু নানা রঙে লিখলে নানা ভাব প্রকাশ পায় বলে লেখকের অভিমত।

ষষ্ঠ প্রকরণ ঃ আলো-আঁধারের লুকোচুরি ঃ

এই অংশে তিনি সৃষ্টির সর্বত্র আলো-আঁধারের যে লুকোচুরি খেলা চলে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আলো-অন্ধকার দুয়ের সমবায়েই সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটে। ছবিতে আলো-অন্ধকার বোঝাতে সাদা-কালো এই দুই রং ব্যবহার করা হয়। আবার সৃষ্টির আলো-অন্ধকার দুই-ই রঙিন।

ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ

''বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ঃ ৬১ হিসেবে এই পুস্তিকাটি বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ সালের বৈশাখ মাসে। মূল প্রবন্ধগুলির প্রাক্‌কথন হিসেবে একটি ক্ষুদ্রাকার 'বিজ্ঞপ্তি' অংশ ছাপা হয়েছিল।

বিজ্ঞপ্তি

ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধাবলি ১৩২১ সালে ভারতী পত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলি ইংরেজি[১] ও ফরাসি[২] ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মূল বাংলা প্রবন্ধগুলি এ যাবৎ ভারতীয় পৃষ্ঠাতেই নিবন্ধ ছিল। চীন ও ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথই প্রথম করেন, এবং এই ক্ষেত্রে এই আলোচনায় এখনো অদ্বিতীয় হইয়া আছে।''[৪]

'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্বের পরিচয় মেলে। এখানে ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধ্যান ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'-এ বর্ণিত চিত্রের ষড়ঙ্গ বা ছয় অঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন কয়েকটি ভাগে ভাগ করে। গ্রন্থটিতে যে ভাগগুলি পাই — পরিচয়, চিত্রে ছন্দ ও রস, ভারত-ষড়ঙ্গ -১ রূপভেদ, ২ প্রমাণ, ৩ ভাব, ৪ লাবণ্য যোজনা, ৫ সাদৃশ্য, ৬ বর্ণিকাভঙ্গ। এইভাবে সজিয়ে তিনি বিষয়টিকে আলোচনা করেছেন।

পরিচয় ঃ

আলোচ্য অংশে তিনি বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' -এ বর্ণিত চিত্রের ষড়ঙ্গ ও তার টীকার যশোধর পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করেছেন। ভারত ও চীন দেশের ষড়ঙ্গে যে অনেক মিল রয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। এরই পাশাপাশি বলেছেন বাৎস্যায়নের আগে আমাদের দেশে চিত্রের ষড়ঙ্গের উপস্থিতি বিদ্যমান ছিল।

চিত্রে ছন্দ ও রস ঃ

প্রথম অংশে তিনি চিত্রের সংজ্ঞা নিরুপণ করেছেন। যার মধ্যে ষড়ঙ্গে ছয়টি উপাদানের উপস্থিতি থাকবে, তাই চিত্র হয়ে উঠবে বলে লেখকের ধারণা। এরপরই এসেছে ছন্দের কথা। চিত্রের উন্মেষ ও সমাপ্তির মাঝে যা বিদ্যমান থাকে তাই ছন্দ। আর রস চিত্র থেকে চিত্রে এবং তারপর চিত্র থেকে পাঠকের চিত্তে বাহিত হয়।

ভারত-ষড়ঙ্গ ঃ ১ রূপভেদ ঃ

আলোচ্য অংশে রূপের ভেদাভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। চোখ দিয়ে চিত্রের রূপভেদ দেখা সম্পূর্ণতা পায় না, একমাত্র জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই আসল রূপ ধরা পড়ে বলে লেখক মনে করেন। তাই চোখের দীপ্তি দিয়ে রূপকে দেখা নয়, মনের দীপ্তি দিয়ে তাকে প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ করতে হবে।

২ প্রমাণ ঃ

প্রমাণ কাকে বলে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন 'প্রমাণানি বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রমা বা ভ্রমবিহীন জ্ঞান লাভ করা। শুধু মানুষের মধ্যেই প্রমা কাজ করে না, নিম্নশ্রেণীর জীবের মধ্যেও তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন চিত্র করে চিত্রেও প্রমা প্রয়োগের তারতম্য লক্ষিত হয়।

২ ভাব ঃ

চিত্রে ভাবের প্রকাশ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। বিভাবজনিত চিত্রবৃত্তি হচ্ছে ভাব। ভাব চিত্তকে বর্ণ দেয়, চঞ্চলতা দেয়। তখনই চিত্র পূর্ণতা পায়, যখন চিত্রের মধ্যে ভাব ও ব্যঙ্গ প্রকাশ পায়।

৪ লাবণ্য যোজনা ঃ

চিত্রে লাবণ্য এর প্রয়োজনের দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। চিত্রে লাবণ্য দীপ্তি সঞ্চার না করলে চিত্রের রূপ, প্রমাণ এবং ভাব সকলই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। লাবণ্য চিত্রের ভাব-ভঙ্গিতে শীতলতা দান করে চিত্রকে সুন্দর করে তোলে। তবে চিত্রে লাবণ্যের প্রয়োগে চিত্রকরের দক্ষতা থাকতে হয়, নইলে তার যথার্থ প্রয়োগ ঘটে না।

৫ সাদৃশ্য ঃ

একের ভাব যখন অপরে উদ্রেক করে তখনই হয় সাদৃশ্য। সাদৃশ্য কোনো এক রূপের ভাব অন্য কোনো রূপের সাহায্যে আমাদের মনে জাগিয়ে দেয়। আবার লেখক বলেছেন, ভাবের অনুরণন যা দেয় তাই উত্তম সাদৃশ্য, আর রূপের অনুকরণ যা দেয় তা অধম সাদৃশ্য। অধম সাদৃশ্য চিত্রকে ফুটিয়ে তোলে না, তাকে বিনষ্টির পথে এগিয়ে দেয়।

বর্ণিকাভঙ্গ ঃ

ষড়ঙ্গের ছয়টি অঙ্গের মধ্যে বর্ণিকাভঙ্গই ষড়ঙ্গ সাধনার চরম ও সর্বাপেক্ষা কঠোর সাধনা বলে লেখকের অভিমত। বর্ণজ্ঞান বা বর্ণিকাঙঙ্গ না জন্মালে চিত্রের পূর্ণতা অধরা থেকে যায়। তুলিতে কতটা রঙ নিয়ে কাগজের উপর প্রয়োগ হবে, এই জ্ঞানই বর্ণিকাভঙ্গ নামে চরম শিল্প।

ষড়ঙ্গদর্শন ঃ

আলোচ্য অংশে তিনি ভারতীয় চিত্রের রস, ছন্দ, রূপ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ — এই অষ্টাঙ্গের সঙ্গে প্রাচ্য জাপান ও চীনের শিল্পে খুঁজে বেড়িয়েছেন। আর শেষে তিনি মনে করেছেন; আমাদের বেদান্ত উপনিষদ্ এর গভীরতম সূক্ষ্ম চিন্তাগুলিই চীনের ও জাপানের চিত্রের ষড়দর্শন রূপে দেখা দিয়েছে।

এভাবেই তিনি 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে চিত্রে ষড়ঙ্গের ব্যবহার ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ভারতশিল্পের মূর্তি

''বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ঃ ৬২ হিসাবে এই পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সনে। প্রকাশক ঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা। এই পুস্তিকার গোড়ায় 'বিজ্ঞপ্তি' সূচক একটি ক্ষুদ্র অংশ রয়েছে। এরপরে রয়েছে, অবনীন্দ্রনাথ লিখিত একটি নাতিদীর্ঘ 'ভূমিকা'। এরপর মূল রচনা শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

এই প্রবন্ধ প্রথমে 'মূর্তি' নামে ১৩২০ পৌষ ও মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। সুকুমার রায় কৃত ইহার ইংরেজি অনুবাদ Some Notes on Indian Artistic Anatomy, কলিকাতা ইণ্ডিয়ান সেসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট কর্তৃক ১৩২১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং শ্রীমতী আঁদ্রে কার্পেলে কৃত ফরাসি অনুবাদ Art et Analonic Hindous, ১৯২১ সালে প্যারিস হইতে প্রকাশিত হয়। মূল বাংলা রচনাটি এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।''[৫]

'ভারত শিল্পে মূর্তি' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের মূর্তি নিয়ে আলোচনা করেছে। মূর্তি রচনাকালে মূর্তি রচয়িতার অনেকগুলি বিষয়ে যে খেয়াল রাখতে হয়, তাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। মূর্তির বিভিন্নভাগ, তার আকৃতি-প্রকৃতি, ভাব-ভঙ্গি নিয়েও আলোচনা করেছেন। আলোচনাকে তিনি তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন। যথা — তাল ও মান, আকৃতি ও প্রকৃতি এবং ভাব ও ভঙ্গি।

শিল্পায়ণ

''বাগেশ্বরী অধ্যাপক পদে অবস্থান কালে অবনীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন, বক্তৃতার প্রায় সমকালেই মাসিক পত্রিকায় তা মুদ্রিত হচ্ছিল; এটা আমরা দেখেছি। বক্তৃতাগুলি গ্রন্থবন্ধ হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু গ্রন্থবন্ধ সেই 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' প্রকাশের কিছুদিন আগে বক্তৃতাগুলির একটা সংক্ষেপীকৃত পরিমার্জিত পুণর্বিন্যস্ত রূপ প্রস্তুত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ঠিক হয়েছিল, 'শিল্পায়ণ' নাম দিয়ে সেগুলির প্রকাশ হবে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক; এ পরিকল্পনা সময়মতো বাস্তবায়িত হয় নি। 'শিল্পায়ণ' -এর প্রথম খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার পর তার দ্বিতীয় খণ্ডটি সাজিয়ে তুলবার আর কোনো আগ্রহ বোধ করেন নি অবনীন্দ্রনাথ।

অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (১৯৫১) পর, 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'ও আর যখন পাওয়া যাচ্ছে না, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে সিগনেট প্রেস থেকে সেই 'শিল্পায়ণ'-এর প্রকাশ হল ১৯৫৫ সালে (চৈত্র ১৩৬১)। এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়, মলাট থেকে শুরু করে সে বইয়ের সর্বত্রই 'শিল্পায়ন' কথাটি ছাপা হয়েছিল 'শিল্পায়ণ' হিসেবে।''[৬]

'শিল্পায়ণ' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থের শিল্প সম্পর্কে যেসব কথা বলেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ ধরে দিয়েছেন। ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর নব নব দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। গ্রন্থটিকে দশটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। শিল্পে অধিকার লাভ, শিল্প

সাধকের দৃষ্টি, কথিত ভাষার সঙ্গে চিত্রিত ভাষার পার্থক্য, সুন্দর ও অসুন্দরের ধারণা, শিল্পের বহির্মুখী আর অন্তর্মুখী গতি, প্রাচীন শিল্পের ক্রমবিলুপ্তি, শিল্পের মজলিশে দর্শক-প্রদর্শকের ভূমিকা, কবির সুন্দর ও সাধারণ মানুষের সুন্দরের মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

স্বর্গীয় রবিবর্মা

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩১৩ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ স্বর্গীয় রবিবর্মার ব্যক্তিজীবন, শিল্প জীবন ও শিল্পের মাহাত্ম্য, ভারতীয় চিত্রশিল্পে তাঁর গভীর দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আদর না অনাদর

১৩১৩ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখায় 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের গ্রীষ্মবকাশ উপলক্ষে পঠিত। ভারতীয় চিত্র শিল্পে হ্যাভেলের দান Art School এর পুনঃ প্রতিষ্ঠার কার্যকারীতা এবং স্বদেশী শিল্পচর্চার পক্ষে মতামত নিয়ে লেখা শ্যামবাবু ও লক সাহেবের দুটি চিঠির কথা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

নামকরণ রহস্য

প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' চিত্রের নামকরণ নিয়ে বিতর্ক উঠলেও অবনীন্দ্রনাথ ঐ নামকরণের পক্ষেই তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কলঙ্ক ভঞ্জন

১৩১৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধেও অবনীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত 'লক্ষ্মণসেনের পলায়ন' নামক চিত্রটির নামকরণ নিয়ে অক্ষয়কুমার মৈত্রের যে প্রতিবাদ করেছিলেন তার বিপক্ষে গিয়ে শিল্পীর শিল্পের পক্ষে নিজের মতামত দিয়েছেন।

শিল্পে ভক্তিমন্ত্র

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই অংশে ভারতশিল্প নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। শিল্পের সাধনা সবার দ্বারা করা সম্ভব নয়, তার জন্য নিজেকে তৈরী করতে হয়। ভারত শিল্পের নবরূপ দেখতে গেলে শিল্পের প্রতি ভক্তির ভাব আনতে হবে, তবেই যে মনোমত রূপ ধরা দেবে।

ভাবসাধনা

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৭-র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত। আলোচ্য প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ভারত শিল্প ছেড়ে পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি কিছু মানুষের অদ্ভুত আকর্ষণের সমালোচনা করেছেন। ভারত শিল্প তার নিজের বৈশিষ্ট্যাবলী নিয়েই যে একদিন শ্রেষ্ঠ রূপে ধরা দেবে, তা তিনি মনে করেন।

কালোর আলো

প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। আলোচ্য প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, শিল্পকে শুধু বহিঃসৌন্দর্যের দিক দিয়ে দেখলে হবে না, শিল্পের আসল সৌন্দর্য ধরা দেয় তার অন্তর্দৃষ্টিতে।

প্রাণ প্রতিষ্ঠা

প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত। এখানে প্রাবন্ধিক ভারতীয়দের স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি অনাগ্রহের দিকটি তুলে ধরেছেন। আবার তাজমহল যে ভারতীয় শিল্পীদের দ্বারাই তৈরী তা তিনি উল্লেখ করেছেন E. B. Havell সাহেবের 'Indian Architceture' পুস্তকের সূত্র ধরে।

কানাকড়ি

প্রবন্ধটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই প্রন্ধটি তিনি 'শ্রীনগদ-ক্রেতা' ছদ্মনামে লেখেন। এখানে তিনি 'ভারতবর্ষ', 'সিন্ধু-সৈকতে' এবং 'কলের বাঁশী' — এই তিনটি ছবি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পত্তন

'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত। এখানেও অবনীন্দ্রনাথ আসামের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের প্রতি অবহেলার কথা ব্যক্ত করেছেন। ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এর নিদর্শন যে ভারতীয় শিল্পীদেরই অবদান একথা হ্যাভেল সাহেব তাঁর 'Indian Architceture' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তার কথাও প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন।

পথে পথে

১৩২২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতীয় শিল্প কোন পথ ধরে অগ্রসর হবে, ক্লেসই জিজ্ঞাসা ব্যক্ত হয়েছে। শিল্পী তাঁর স্বাধীন সত্তা নিয়েই শিল্প সাধনার পথে এগিয়ে যাবে।

আদ্যিকালের ছবি

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আলোচ্য অংশে তিনি গুহাবাসী মানুষের দ্বারা পাষাণের গায়ে খোদাই করা চিত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। শিল্পের দিক থেকে যার মূল্য কোনো অংশেই কম নয়।

প্রশ্নোত্তর

'ভাণ্ডার' পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। গভর্নমেন্ট শিল্পবিদ্যালয়ে সংগৃহীত বিলাতি ছবিকে নিলামে বিক্রি করে তার স্থানে দেশীয় চিত্রশিল্প শিক্ষা দেবার কাজ শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গই এখানে আলোচিত হয়েছে।

আলপনা

প্রবন্ধটি ১৩২৫ বঙ্গাব্দে 'পার্বনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে প্রাবন্ধিক 'না শেখার সুন্দর লেখা' আলপনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার শ্রেণী বিভাগ, শিল্প সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করে। আর মেয়েদের হাতে এই আলপনা যেন আলো হয়ে দেখা দেয়।

রূপ-রেখা

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। শিল্পে চিত্রে রেখার টানে কিভাবে নানা রূপ ফুটিয়ে তোলেন, তার কথাই অবনীন্দ্রনাথ বিভিন্ন ছবি নিয়ে আলোচনা করে দেখিয়েছেন এই প্রবন্ধে।

শিল্প ও শিল্পী

প্রবন্ধটি 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি শিল্পী তাঁর শিল্পে কোন দৃষ্টি ও ভাবকে ধরে দেন, তার আলোচনা করেছেন। যা দেখছেন তাই চিত্রে চিত্রায়িত করা নয়, শিল্পীর কাজ মনের ছবি ফুটিয়ে তোলা।

রস ও নীরস

'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৭ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক আমাদের জীবনে ও আর্টে রস ও নীরসের অনুসন্ধান করেছেন। বর্তমানকালে ছেলেদের জীবন যে নীরস শিক্ষা প্রণালীতে অতিবাহিত হচ্ছে, সেই দিকটির কথাও তিনি তুলে ধরেছেন।

শিল্পের অন্ধকার যুগ

প্রবন্ধটি ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যায় 'প্রবর্তক' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতীয় শিল্পে যে সুবাতাস বইছিল, বর্তমানে তার বন্ধের কারণ তিনি এখানে অনুসন্ধান করেছেন। এরজন্য তিনি আমাদের মনন ও মানসিকতাকেই মূলতঃ দায়ী করেছেন।

বাণী ও বীণা

'প্রবর্তক' পত্রিকায় ১৩২৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, চিত্রকর যেমন ছবি রচনা করে কথা ফুটিয়ে তুলেছেন, কবি তেমনি কথার দ্বারা ছবির সৃষ্টি করেন।

ছেলেভোলানো ছড়া

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ছড়ার বিভিন্ন দিকি সম্পর্কে তার মতামত তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ছড়ার মধ্যে যে ছবি

থাকে তা যেন আমাদের কাছে জীবন্ত রূপে ধরা দেয়। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় — ''খুব বড় বড় পেন্টারের হাতে আঁকা 'Sunset The Evening Lamp' এমনই কত কি অনড় অচল ছবি মাসিক পত্রিকায় তিন বর্ণে মুদ্রিত দেখেছি, তার এতটুকু একটা ছড়ার কাছে হেরে যায়।''[৭]

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন চিত্রশিল্পী। তাই ছড়ার চিত্রধর্মীতা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

—০—

তথ্যসূত্র

১) বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৪৭১-৪৭২।

২) অবনীন্দ্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০২ শকাব্দ, পৃঃ ১৭৭।

৩) সহজ চিত্র শিক্ষা, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৪৮৯।

৪) ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৪৮১।

৫) ভারত শিল্পের মূর্তি, অবনীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, জানুয়ারী ২০১১, পৃঃ ৪৮৭।

৬) শিল্পায়ণ, অবনীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭, পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯।

৭) দাশ অনাথনাথ, রায় বিশ্বনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগ্রহীত ছেলেভুলানো ছড়া, আনন্দ, শ্রাবণ ১৪০২, পৃঃ ২৩৭।

—০—